ইকো পর্যটন কি গ্রামীণ পাহাড়িদের বিকল্প পথ হতে পারছে?

শুরু হয়েছে নতুন
ক্রাইম থ্রিলার
'শালবনে রক্তের দাগ'

শুরু হয়েছে নতুন ধারাবাহিক
ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৭। ১২ টাকা

ayurveda

The Science Of Life

Divyaur®

PHARMAKRAFT®
Crafting Wellness

Launching

Ayurvedic Range of Products

Divyaur® (A Division of PHARMAKRAFT®)

PHARMAKRAFT THERAPEUTICS PVT. LTD.

For Distributorship Please Call : 8697773093 (10.30 am to 6 pm)

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

রাজবাড়ির দিঘি এখন জলপাইগুড়ির বিশেষ স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এটির সৌন্দর্য্যায়নের ফলে বহু মানুষ আসছেন একটু মুক্ত পরিবেশে শ্বাস নেওয়ার জন্য। জলপাইগুড়ির শহরের মানুষও যেমন ভিড় করেন এখানে তেমনই যেসব পর্যটকরা আসছেন বাইরে থেকে তাঁদের জন্যও এটি একটি দ্রষ্টব্য স্থান। নোংরা আবর্জনায় মৃতপ্রায় শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যময় দিঘিটিকে সংস্কার করার ফলে যেন নতুন করে অক্সিজেনের যোগান ঘটেছে শহরের ফুসফুসে। তেমনই রাজবাড়ির দিঘি একঘেয়ে নাগরিক জীবনে নিয়ে এসেছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ডুয়ার্সে আসছে ফোর লেন যুগ!

পথ। হয় খোঁজ নয় বানাও। 'উন্নতির পথ' কথাটার মধ্যেই লুকিয়ে আছে পথের সঙ্গে উন্নতির অনিবার্য।

ডুয়ার্সের বুক চিরে ছুটে যাওয়া জাতীয়পথ এদ্দিন একা ছিলেন। এবার তার তিনটে সখা জুটতে চলেছে। 'ফোর লেন' হচ্ছেন তিনি। তার গুরুত্ব তো কম নয়। উত্তর-পূবের রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনিই ভরসা। জমিজট কাটাতে দেরী হচ্ছিল বলে এদ্দিন থমকে ছিল ফোর লেনের কাজ— যাকে আমজনতা বলে 'ফোর্লান'।

ডুয়ার্সে 'ফোর লেন' গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হলে উন্নতির পথ আরও চওড়া হবে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বারোবিশা থেকে অ্যাম্বুলেসঙ্গে রোগীকে চাপিয়ে শিলিগুড়ি নিয়ে আসতে বাড়তি ঘণ্টা জুটবে পরিবারের হাতে। আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার থেকে বাগডোগরা যেতে কেউ হাতে বাড়তি দু-ঘণ্টা সময় না নিয়ে নিশ্চিতে বের হতে পারবেন। এই বাড়তি সময়ের বড়ো কারণ জাতীয়পথে জ্যামের আশঙ্কা। জ্যামের প্রধান কারণ পথটা একা। এক লেন।

আরও হবে। যেমন জমির দাম বেড়ে যাওয়া, নতুন আধুনিক বসতি স্থাপন হওয়া— এইসব। তার সঙ্গে ক্রাইম আসবে অবশ্যই, কিন্তু বেড়াল চুরি করতে পারে ভেবে মাছ ভাজব না, তা কি হয়?

ডুয়ার্সে যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল অবলম্বন হল পথ। এখানে রেল কম, জলপথ নেই। জনতার প্রধান ভরসা বাস। মূল যে সড়ক শিলিগুড়িছেড়ে তিস্তা টপকে ময়নাগুড়ি ঘেঁসে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা-কোচবিহার হয়ে সংকোশ টপকে আসামে চলে গেছে, তার সিংহভাগ একাই ছিল এদ্দিন। ফোর লেনের কাজ শেষ হলে একটা যুগের অবসান হবে।

হ্যাঁ মশাই। অতিশয়োক্তি নয়। সত্যিই একটা যুগের অবসান।

উৎসবের মেজাজে মালবাজার

জলপাইগুড়ির আড্ডাঘরে গত ১৯ সেপ্টেম্বর 'এখন ডুয়ার্স' আয়োজিত সাহিত্য আড্ডায় অতিরিক্ত জেলাশাসক অম্লানজ্যোতি সাহা, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক সূর্য ব্যানার্জি ও আরও বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে মালবাজারের সব্যসাচী ঘোষ যৌক্তিক দাবি তুলেছিলেন, এবার জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা হোক মালবাজারে। আড্ডায় উপস্থিত সবাই সমর্থন জানিয়েছিলেন এই প্রস্তাবকে। মূলত তারই ফলশ্রুতি হিসেবে দীর্ঘ বারো বছর বাদে মালবাজারে আবার বইমেলা। ২৭ ডিসেম্বর'১৭ থেকে ২ জানুয়ারি'১৮। তার আগে ১৬-১৮ ডিসেম্বর চলবে এবারের 'মাল নাট্য উৎসব'। অর্থাৎ এখন উৎসবের মেজাজে রয়েছে মাল শহরের মানুষ। সবার জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইল আগাম।

চতুর্থ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা,
১-১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৮

ইকো পর্যটন গ্রামীণ পাহাড়িদের বিকল্প পথ হতে পারছে? ২০

ডুয়ার্সে হাতি আজ বিপন্ন! ২৩

কোচবিহারের কড়চা

রাজনগরের গ্ল্যামার ফেরাতে পারবেন নতুন পুরপ্রধান? ১৩

উত্তরপক্ষ ১৬

বাইরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা আজকাল অনেক স্বচ্ছন্দ

পর্যটন:রংটং ২৫

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

শালবনে রক্তের দাগ ৩৫

তরাই উৎরাই ২৬

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৪০

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৬

ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪৪

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৬

শ্রীমতী ডুয়ার্স

শিকড়ের টানে বল্লরীরা ৩০

ডুয়ার্সের ডিশ ৩০

বালিকাবেলার যে ডুয়ার্স আমার চেনা ৩১

প্রচ্ছদ ছবি: জয়ন্ত গুহ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুচরো ডুয়ার্স

মোর্চায় মরচে

গুরুংবাবুর শেষের শুরুং করে দিদি তুখোর ফর্মে ডুয়ার্সে সম্প্রতি ব্যাটিং করে গেলেন। তিস্তা মেরামত নিয়ে দিস্তা দিস্তা অভিযোগ পাওয়ায় আগে থেকেই একটা ভারী ব্যাট আনিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম ছক্কা সেখানেই। বলে কি না ২৯ পার্সেন্ট লেসে কাজ! ইয়ার্কি! ছক্কা সোজা গাজলডোবা পাড়। তারপর হাতির হাতে হত্যা তালিকায় নামতার ভুল দেখে আরেকটা ডাবল ওভার বাউন্ডারি! ছক্কার তেজ দেখে আধিকারিকরা নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দরকারে পরলোকগতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তালিকা মেরামত করবেন। তারপর ধরুন শিলিগুড়িতে সোজা ব্যাটে ছক্কা মেরে বলে দিয়েছেন, কোনও চিকিৎসক নয় জয়নগরের মোয়া। পাঁচগন্ডা ডাক্তারকে শোকজ করার জন্য জলপাইগুড়িতে এক স্বাস্থ্যকর্তাকে তো স্রেফ খোঁচা দিয়েই ছয়। শেষে বল হাতে এমন গুগলি ঝেড়েছেন যে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার উইকেটেই মরচে পড়ে গেল! ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ল গো! তা দিদির এই মারকাটারি ফর্মে কি সবাই খুশি? না না কাকা! তাই হয় নাকি? তাই হলে কি আর খুচরো লিখতুম গো? শুনচি নাকি ফর্মা দেখে দলেরই কেউ কেউ পেসমেকারের দর জানার জন্য গোপনে নেট ঘাঁটছে।

হুসলু হুলুস্থুলু

অজগর হয়েছিস ভাল কথা। এদিক ওদিক ঘুরবি, গেরস্থের হাঁস-মুরগি খাবি, মাঝে মাঝে ধরা পড়বি— এটাই তো একটা আধুনিক অজগরের কর্তব্য! পাকামো করে গাছে উঠতে কে বলেছিল তোকে? তাও আবার বাঁশ গাছে গো! রে ময়াল! এই ভয়াল বুদ্ধি তোকে কে দিয়েছে রে বাপ? ঝাড়ের বাঁশ ঘাড়ে নিয়ে শেষে হুলুস্থুল ফেলে দিলি তল্লাটে! লোকজন ধরে বেঁধে নামাল বটে তোকে গাছ থেকে, কিন্তু তার জন্য কী কাণ্ড হল বল তো? আটফুটি খোকা অজগরকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাঁশ গাছ থেকে নামান কি চাট্টিখানি কথা। কম কসরৎ করতে হল পাব্লিককে!? তা শেষ পর্যন্ত গরুমারা অরণ্যে ফিরে গেছিস জেনে ভাল লাগছে। ফিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে শনিপুজো দিস একটা। হুসলু ডাঙ্গার কাণ্ড বাপে।

হায়

অমন শান্ত সজ্জন রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত কাণ্ড দেখলে রাজদণ্ড হাতে দু-ঘা বসিয়ে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়তেন নির্ঘাৎ। বাজার নয়, হাট-শপিং মল নয়, রাস্তার মোড় নয়— খোদ রাজবাড়ির সিসি ক্যামেরার এই দশা! দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে ক্যামেরা! কোথাও আবার তার দু-টুকরো! আবার দ্যাক, ক্যামেরার লেন্স ছাদের দিকে তাক করে ঘুরে রয়েছে! পাব্লিক কি টিকটিকির মত দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠছে নাকি হে দায়িত্ববান প্রজাবর্গ! নাকি যে ক-টা রত্ন প্রাসাদের যাদুঘরে পড়ে আছে, সেগুলোও ভ্যানিশ করে দেওয়ার আশায় উর্দ্ধমুখী ক্যামেরা বসিয়েছ? সত্যি মামা! কোচবিহার রাজবাড়ির নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান ভরসা সিসি ক্যামেরার হাল দেখে সত্যিই কান্না পাবে। হেরিটেজ কমিটি অবশ্যি জোর প্রতিবাদ করছে। কিন্তু এসব কী করে হয় মামা? নাকি কোচবিহার রাজবাড়ি বলেই হয়। হায়!

ইংরিজির মাশুল

এ জন্যেই বলি রে বাপ ঠিকঠাক ইংরিজিটা শেখ। যদি শিখতিস তবে কি আর ধরা পড়তিস? ভুল ইংরিজি পরীক্ষায় লিখলে নম্বর কাটা যায়, কিন্তু বাস্তবে লিখলে যে জেলে যেতে হয়, তা জানতে মামা? শোনো তবে স্টোরি। নেভিতে হেভি চাকরি দেবে বলে আসাম থেকে অ'সাম তিন পাব্লিক এসে জলপাইগুড়িতে বেশ ফাঁদ পেতেছিল। চাকরিপ্রার্থী মুরগিরা হেসে হেসে পা দিচ্ছিল সেই ফাঁদে। তারপর ঠিক হল যে মুরগিদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। তা অ-নে-ক মুরগি আসবে বলে কোতয়ালকে চিঠি লিখে পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখেছিল এক আসামী। নেভির নিয়োগ কর্তা বলে কতা! চিঠি ইংরিজিতে না লিখলে মান থাকে? কিন্তু পত্রপাঠ কোতয়ালের ভারি সন্দেহ হল। নেভি কর্তার এ কী ইংরিজির ছিরি!? সত্যিকারের কর্তা তো? কোতয়াল পাত্তা লাগালেন। নেভিকর্তাদের জেরা করতেই জানা গেল যে তিনটেই ভণ্ড। চাকরির টোপ ফেলে টাকা গেঁথে হাওয়া হওয়ার ধান্ধা। অতঃপর গ্রেপ্তার। আহা! ইংরিজিটা যদি ঠিকঠাক লিখতিস বাছা তবে এতক্ষণে বাড়ি ফিরে মুরগির ঠ্যাং দিয়ে শিক্ষক হুইস্কি খেতিস!

কচুরি প্রচুরই

তা রসিক বিল মাঝে মাঝেই বেরসিক হবে তা আর নতুন কী? আবার হয়েছে। রাশি রাশি কচুরি। না না, সেই কচুরি নয় যে ছোলার ডাল দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। এ হল পানাযুক্ত কচুরি। প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা ডানা মেলে রসিক বিলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে সব ঠেলে সরিয়ে টুরিস্টরা বোটিং করতে গিয়ে পড়ছে মহা ফ্যাসাদে। এমনিতেই পনের মিনিট নৌ চালনার জন্য কুড়ি টাকা

খচ্চা। তারওপর যদি সোয়া তের মিনিট কচুরি খেতেই চলে যায় তবে দাঁড় বাইবে কখন? ফলে রসিক বিল আবার কচুরি বিল। শোনা গেল কচুরি নাকি গত দু-বছরে সাফ করা হয় নি। অ্যাঁ! দু-ব-ছ-র? দেখিস বাপ! কচুরিতেই থাকিস! কচুরি থেকে কচু হতে বেশি দিন লাগে না কিন্তু।

ক্রান্তিকারী

ক্রান্তির কাছে কী ক্রান্তিকারি ব্যাপার মামা! শ্রমিক সাইকেল নিয়ে ফিরছিল বাড়িতে।

হঠাৎ দেখে সামনে এক জোড়া চিতা। মুখোমুখি তারা। শ্রমিকের রক্ত ঠান্ডা। তারপর শুরু হল দুই বাঘার ধুন্ধুমার লড়াই। চোখের সামনে চিতার কুস্তি দেখে শ্রমিক প্রায় মূর্ছা যায় যায়। শেষে কুস্তির প্যাঁচ কষতে কষতে চিতাবাবুরা একটু আড়ালে যেতেই শ্রমিকের ভোঁ দৌড়! সাইকেল ফেলে। তারপর লোকজন নিয়ে আবার অকুস্থলে ফিরে এসে দেখে তাজ্জব ব্যাপার! চিতা নাই। সাইকেলও নাই! তা হলে কি কুস্তিতে যে চিতাটা গোল্ড মেডেলে পেল, সে-ই কি পুরস্কার ভেবে নিয়ে গেল সাইকেলটা? কিন্তু সাইকেল নিয়ে কী করবে চিতা? সে নিজেই তো সাইকেলাপেক্ষা দ্রুতগামী! তা হলে? বেচারা শ্রমিক শেষে ধরে নিয়েছে যে চিতা সাইকেল নিয়ে গেছে তার ছানার জন্য। সম্ভবতঃ সবুজ সাথীর সাইকেল পায় নি তার ছানা।

কেন ভাই

বনে বনে হানা দিয়ে বুনোদের ডিস্টার্ব করে অনেক দিন ধরেই ছবি তুলছিলেন তিনি। চুরি করে ঢুকে পড়ছিলেন নিষিদ্ধ অরণ্যে। একবার ডেকে সাবধান করে দিয়েছিল বন বিভাগ। তারপরেও অপকম্ম চালিয়ে যাওয়ায় তক্কে তক্কে ছিল বনকর্তারা। অবশেষে হাতেনাতে খপাৎ! পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার। রীতিমত শিক্ষিত মাথা। তারপরেও কেন এত গোবর ভরে রেখেছিস ভাই? বুনোরা কি তোর ঘরে ঢুকে ছবি তোলে? তারা কি তোকে আপিসে যাওয়ার পথে ঢিল ছুঁড়ে খেপায়? থাক এবার চিড়িয়াখানায়, থুড়ি গারদে। বুনোরা টিকিট কেটে দেখতে আসবে তোকে। জলপাইগুড়িতে।

টুক্রাণু

জলপাইগুড়িতে চিলড্রেন্স পার্কে বসছে টয় ট্রেন। শীতঘুমের জন্য সাপেরা গেরস্তের ঘরবাড়ি বেশি পছন্দ করছে, ধূপগুড়িতে। নাথুয়াতে বাঘা চোরদের দাপটে ত্রাস্ত

গেরস্ত। ভূতুড়ে গ্রেনেড নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে জোর হুলুস্থুল হলদিবাড়িতে। মাথাভাঙ্গায় মরসুমী পাখিরা আসছেন। ডিভান হল একটি বাঘের নাম যে বেঙ্গল সাফারিতে আসল বলে। গাছ থেকে চিতা পেড়ে আছড়ে হত্যা হাতির— বেতগুড়ি চা বাগানে। শিলিগুড়িতে দেদার খাদ্য মিলছে বলে কাকেরা সেখানে ফ্ল্যাট কিনছে। পথ বাতির বাড়ন্ত বলে নিশাকালে ঘোর নিশি নিশিগঞ্জে। ভোটপট্টি স্টেশান থেকে বিনা টিকিটে ট্রেনে ওঠা বাধ্যতামূলক করেছে রেল। কোচবিহার রাসে সুপার হিট পুতনা রাক্ষুসী। মালবাজারে গ্রিন সিটি মিশন ভীষণ স্লো চলছে। নকশালবাড়িতে রাসমেলা দেখতে এল হাতিরা। পুরসভা হতে চাওয়া ময়নাগুড়িতে পুনরায় পঞ্চায়েত ভোট। ধূপগুড়ি হাসপাতালের জেনারেটর অনেক দিন ধরে কোমায়। ডুয়ার্সে ধান পাকার সংবাদে হাতিরা উল্লসিত। আমবাড়ির যুবক বাইক স্টার্ট করতে গিয়ে দেখে কি একটা গোখরো সাপ হেলমেট ছাড়া সিটে বসে আছে। সিন্ডিকেট রাজ এখন চাংড়াবান্ধা সীমান্তে পৌঁছে গেছে।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার **৪০৬৪৪০৯৭**

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে রইল বাগরাকোট, লিজ রিভার চা-বাগানের পরিচিতি। একই মাল মহকুমার অন্তর্গত দুটি বাগান— গুডরিকসের লিজ রিভার টি এস্টেট এবং ডানকানসের বাগরাকোট চা বাগিচা, প্রকৃতিগত চরিত্রে কোনও ভেদ থাকবার প্রশ্ন নেই অথচ ক্ষেত্রসমীক্ষায় মিলল পুরোপুরি বিপরীতমুখী চিত্র।

ডানকানস এবং গুডরিকস— দার্জিলিং, আসাম এবং তরাই-ডুয়ার্সের বাগিচা শিল্পে এমন দুটি কোম্পানি যাদের চা-শিল্প এবং বাণিজ্যের সুখ্যাতি দেশ ছাড়িয়ে সুদূর বিদেশেও ছড়িয়ে আছে। ডানকানস গোয়েঙ্কারা হল পশ্চিমবঙ্গের চা-শিল্পের অন্যতম প্রধান স্টেক হোল্ডার। কোম্পানির টি প্ল্যান্টেশন ডিভিশনের মালিকানায় ১৫টি বাগান আছে। উত্তরবঙ্গের তরাই, ডুয়ার্স এবং দার্জিলিঙের প্রায় আট হাজার হেক্টর আবাদি জমিকে কেন্দ্র করে ডানকানের চা সাম্রাজ্য। বছরে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ কেজি মেড টি প্রস্তুত করতে সক্ষম এই চা সাম্রাজ্য। অন্যদিকে গুডরিকস কোম্পানিরও প্রধান ব্যবসা চা চাষ এবং চা উৎপাদন। ভারতবর্ষের প্রথম তিনজন চা উৎপাদকের মধ্যে অন্যতম উৎপাদক গুডরিকস। অত্যন্ত উন্নত মানের চা উৎপাদন, চা সংক্রান্ত গবেষণা, চায়ের মান বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে দার্জিলিং এবং আসাম ব্র্যান্ডের চা-কে পরিচিত করানোর অন্যতম ব্র্যান্ডনেম গুডরিক।

বাগরাকোট চা বাগান

চা শিল্পের উন্নতি, অগ্রগতি, অবনতি এবং শ্রমিক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে পৌঁছালাম ১৮৭৫-৭৬ এ গড়ে ওঠা বাগরাকোট টি এস্টেটে। ১৮৫৯ সালে স্কটিশ ব্যবসায়ী প্লেফেয়ার ডানকান চা ব্যবসার জন্য ডানকান এন্ড কোম্পানির পত্তন করেন। বিদেশের বাজারে উৎকৃষ্ট চা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কোম্পানি সুনাম অর্জন করার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ডানকানস ইন্ডিয়া লিমিটেড চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করে। চা ব্যবসাতে সাফল্য আসার ফলে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল। পাটশিল্পেও কোম্পানি অর্থ বিনিয়োগ করে। ব্যবসার পরিধি বাড়ার ফলে কোম্পানির নাম বদলে হয় ডানকানস ব্রাদার্স লিমিটেড বা এবিডি এল। এই সময়ে কোম্পানির পৃথক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য দু'জন পৃথক বোর্ড অব ডাইরেক্টরস ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে চা শিল্পের রমরমা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মূলধনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় উত্তরোত্তর। প্রবেশ করে দেশীয় সুদের কারবারী হিসাবে ধনী মাড়োয়ারি বেনিয়ারা। চা কোম্পানিগুলি তাদের কাছ থেকে প্রচুর ঋণ নিতে শুরু করে। স্বাধীনতার পরে বিদেশি চা-করেরা ভারত ছাড়তে শুরু করে। বিদেশে ফিরে যাওয়া মালিকদের বদলে দেশিয় ঋণদাতা শ্রেণির প্রবেশ ঘটল

চা-বাগান মালিকানায়। এইভাবেই ১৯৫৯ সালে গোয়েঙ্কা পরিবারের প্রাণ পুরুষ কেশবপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ডানকানস ব্রাদার্স কিনে নিলেন, গোয়েঙ্কা পরিবার ক্রমে ডানকান গোয়েঙ্কা নামে পরিচিতি লাভ করল।

চা বাগিচা, চা শ্রমিক বা চা মালিকেরা যতই সমস্যায় পড়ুক না কেন, ডানকান গ্রুপের বাগানগুলির সমস্যা যেন অনেক বেশি। এই রকমই একটি ডানকানস গ্রুপ পরিচালিত বাগান 'বাগরাকোট'। উত্তরবঙ্গের তরাই এবং ডুয়ার্সের প্রচুর বাগান ডানকানস গোষ্ঠীর হাতে। ২০১৬ সালে বাগরাকোটসহ অন্যান্য বাগানে যখন মজুরি নিয়ে তীব্র সংকট সেই সময়ে ডুয়ার্স এবং তরাইতে এসে বাগান পরিদর্শন করে ম্যানেজার এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডানকানস গোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। চা শিল্পের প্রেক্ষাপটে রাজ্যব্যাপী হৈ হৈ ফেলে দেওয়া ডানকানস সংকটের পর গৌরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা কেন্দ্রীয় অধিগ্রহণের বাইরে থাকা চা বাগিচাগুলি পরিদর্শন করতে আসেন বাগরাকোট চা বাগিচায় এবং বাগান পরিদর্শন করে ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিচালকদের কাছ থেকে বুঝে নেন। এরপর উত্তরকন্যায় টি ডাইরেক্টরেটের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন ডানকানসের অন্যতম কর্তা জিপি গোয়েঙ্কা। বাগান খুলতে এবং সার্বিকভাবে চালাতে ডানকানস কর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেয় রাজ্য সরকার। বাগানগুলির সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ডানকানস কর্তাও উঠেপড়ে লাগেন। বাগান খোলার ক্ষেত্রে বাগানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে, বাগান নিয়ে যাতে আর কোনও মামলা না হয় সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা এবং বাগান চালাতে আর্থিক সাহায্য করার বিষয়ে টি ডাইরেক্টরেটের অন্যতম সদস্য সৌরভ চক্রবর্তী এবং মোহন শর্মার সঙ্গেও বিস্তারিতভাবে আলাপচারিতা করেন জিপি গোয়েঙ্কা।

মালবাজার মহকুমার বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাগানটি কোনও ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য নয়। ১৮৭৬ সালে ডানকানস গ্রুপ বাগানটির মালিকানা লাভ করে। বাগানের ম্যানেজারিয়াল স্টাফের সংখ্যা ৮। বাগিচায় ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৫টি। কিন্তু শ্রমিক স্বার্থ লঙ্ঘিত হচ্ছে বারেবারেই। সময়ে সময়ে ইউনিয়ন নেতারা মালিকের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন অর্থ বা অন্যান্য সুযোগসুবিধার বিনিময়ে এই ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। বাগানের গ্রস এরিয়া ৮০৮.৬৩ হেক্টর। গ্র্যান্ট এরিয়াও ৮০৮.৬৩ হেক্টর। সেচ সেবিত এবং ড্রেনযুক্ত আবাদি ক্ষেত্র ৪৭৭.২১ হেক্টর। আবাদযোগ্য বাগিচা অঞ্চল ৪৭৭.২১ হেক্টর। প্রতি হেক্টর থেকে মোট ১৯৬৮ কেজি চা পাতা পাওয়া যায়। বাগিচায় সাব স্টাফের সংখ্যা ৪৭। করণিক ১৮ জন। ক্ল্যারিকাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ২৭। বাগিচায় শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৯৯১। মোট জনসংখ্যা ৬৮৬২। দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে নিযুক্ত মজুর ১৩০০। বিগত অর্থবর্ষে নিযুক্ত ক্যাজুয়াল বিঘা শ্রমিক প্রায় ৭০০ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত শ্রমিক এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৫২। সাব স্টাফ (ওএমআরই) ৪৭ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল সাব স্টাফ ২৭। মোট শ্রমিক ১৪৩৪। মোট অশ্রমিকের সংখ্যা ৫৪২৮ যারা বাগরাকোট চা বাগিচার সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

অতীতে এখানেই ওজন হত চা পাতি, লক্ষ লক্ষ কেজি। এখন পরিত্যক্তই বলা চলে

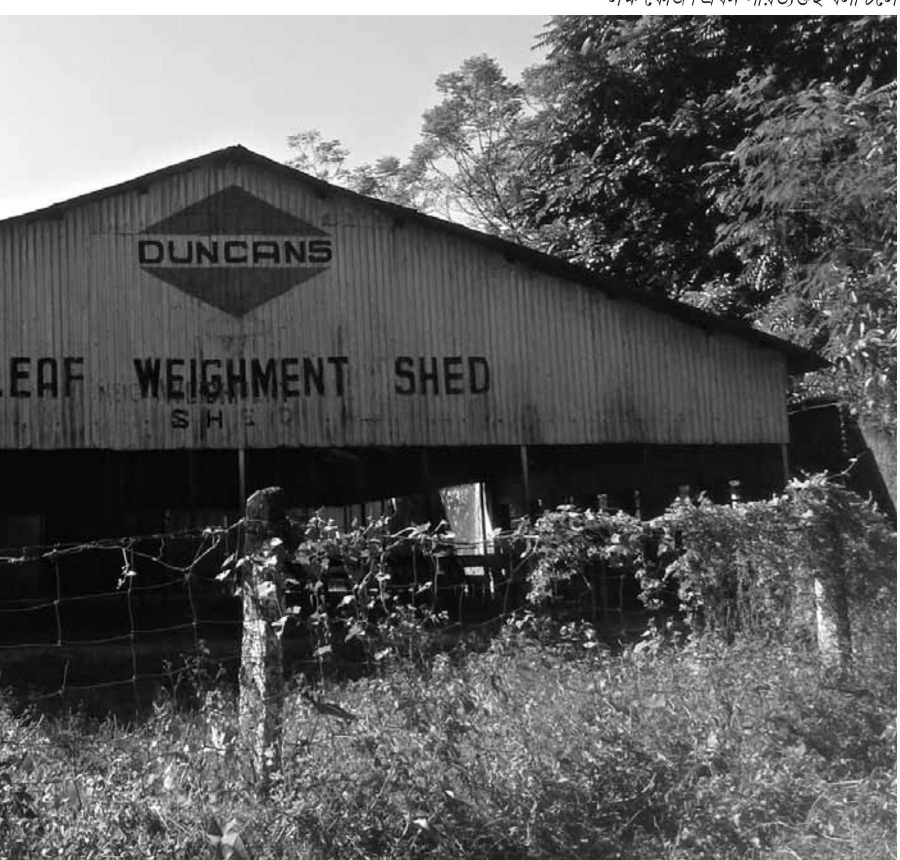

বাগরাকোট চা বাগিচায় বছরে গড়ে ৪০ লক্ষ কেজি কাঁচা চা পাতা উৎপাদিত হয়। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত চা বছরে গড়ে ৯-১০ লক্ষ কেজি। কেনা চা পাতা থেকে গড়ে চল্লিশ হাজার কেজি তৈরি চা ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয়। কোনও কোনও সময়ে উৎপাদন ভাল হলে ১০ লক্ষ কেজি ব্লেন্ডেড টি করার মতো পরিকাঠামোও রয়েছে বাগানে। বাগানে বছরে গড়ে ২০ লাখ কেজি বিভিন্ন ধরনের চা তৈরি করার রেকর্ড রয়েছে। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষসহ অন্যান্য কারণে সাম্প্রতিককালে উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইনঅরগ্যানিক সিটিসি গ্রেডের তৈরি ডানকানস গ্রুপের চায়ের বাজার ভাল। বাগরাকোট চা বাগিচা এম.জি.এন.আর.ই.জি. এস.-এর সুবিধা পায় না। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বাগানটির ফাইনানসিয়াল পার্টনার। লিজ হোল্ডারদের নাম ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। বর্তমান লিজের মেয়াদ ২২.০৫.২০০৮ পর্যন্ত ছিল। লিজ রিনিউয়ালের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে কি না জানা যায়নি।

ব্যক্তিগত ব্যবহারিক মিটার সহযোগে বাগিচায় বৈদ্যুতিক সুবিধাযুক্ত মোট শ্রমিক আবাস ৮৬৫। মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১৪৩৪। বছরে গড়ে ৮/১০ লাখ টাকা শ্রমিক আবাস মেরামতের জন্য ব্যয় করত গোয়েঙ্কারা। কিন্তু বছর তিনেক ধরে বিপরীতধর্মী চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত দিনে নতুন বাসগৃহ নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৩৮,৩৩,৪৫৩ টাকা খরচ করার সরকারি সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থবর্ষ ২০০৯-১২ এর পরবর্তীকাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে শ্রমিক কল্যাণে খরচ করার গ্রাফ নিম্নমুখী। ২০১৬ সালে পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। শ্রমিক আবাসে শৌচাগারের

সংখ্যা ৮৬৫। বাগরাকোট বাগানে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য প্রথম আবেদন করা হয় এবং কোটেশন মানি প্রদান করা হয় ২৬.০৩.৯৭ সালে। প্রথম পর্যায়ে ২৫৫, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২২৫, তৃতীয় পর্যায়ে ৩৮৫ টি পরিবারে ব্যক্তিগত মিটার বসিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করা হয়। মোট ৮৬৫ টি বাড়ি বৈদ্যুতিক সুবিধাযুক্ত।

বাগরাকোট চা বাগিচার ডাক্তার এস.কে. মোহান্তি ওড়িশার এম.কে.সি.জি. কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত এই ডাক্তার বাগরাকোট চা বাগিচাতেই থাকেন। বাগিচায় দু'জন ট্রেন্ড নার্স, একজন করে কম্পাউন্ডার, হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং মিড ওয়াইভস আছেন। বাগরাকোট বাগিচায় ওষুধের সরবরাহ কার্যত বন্ধ। গড়ে বছরে ৯-১৫ জন মেটারনিটির জন্য বাগানের হাসপাতালে আসেন। বাগিচায় দু'জন লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন। এঁরা হলেন সন্দীপ ঘোষ এবং এম ভট্টাচার্য। তাঁদের উভয়েরই ডিপ্লোমা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা অনুমোদিত। সন্দীপবাবু ১.৫.২০০১ এবং ভট্টাচার্যবাবু ১১.৫.২০০৫ এ কাজে যোগদান করেছেন। বাগরাকোট চা বাগিচায় ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে ভরতুকি দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্যান্টিন চালানো হয়। ক্রেশ আছে। ধোয়াকাচার ব্যবস্থা, শৌচাগার, শিশুদের পোশাক বা গরম পোশাকের ব্যবস্থা নেই। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শিশুদের জন্য দুধের ব্যবস্থাও করা হত কোনও এক সময়ে। ক্রেশে অ্যাটেনডেন্টের সংখ্যা ৩ জন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে পেয়েছি এক জনকে। বাগরাকোটে মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। স্কুলের শিশুদের পৌঁছাবার এবং নিয়ে আসার জন্য বাগিচার বাস যায়। বাসের সংখ্যা ১টি। বাগানে ক্লাব এবং খেলার মাঠ দুইই আছে। হাসপাতালে মেল ওয়ার্ড ১২টা, ফিমেল ১২, আইসোলেশন ৬টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৬টি, অপারেশন থিয়েটার, অ্যাম্বুলেন্স আছে। বছরে গড়ে ১৫০ জনকে মেডিক্যালে রেফার করতে হয়।

বাগানে ২০০৯-১০ সালের পর থেকে প্রভিডেন্ড ফান্ডে টাকা জমা দেবার পরিমাণ কমতে শুরু করেছিল। তথ্য সূত্র বলছে ২০০৯-১০ সালে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, ২০১০-১১ তে ৯৩ লাখ, ২০১১-১২ তে ৭৪ লাখ, ২০১২-১৩ তে ২৪ লাখ মাত্র শ্রমিকদের পিএফ বাবদ জমা পড়েছে। শ্রমিকদের দেয় বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ২৫ লাখ টাকা। মালিকদের পক্ষ থেকে বকেয়া জমা দিতে হবে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। শ্রমিকদের মজুরি, রেশন, জ্বালানী, ছাতা, চপ্পল, কম্বল বাবদ বকেয়া অর্থ দেওয়া হলেও অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে এখন টাকা পয়সা প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুসারেই বাগিচায় শ্রমিক মজুরি প্রদান করে মালিকপক্ষ। ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত প্রায় সাতান্ন লাখ টাকা গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়েছে শ্রমিকদের। মোট ২২২ জন শ্রমিককে এই প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হয়েছিল। ২০১২-১৩ পর্যন্ত ১৫৭ জন শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি বকেয়া ছিল। বাগিচায় এবারেও ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দেওয়া হয়েছে। মোট ১৯৩৬ জন শ্রমিক। বোনাস প্রদানের বাৎসরিক অর্থমূল্য প্রায় ৭৮ লাখ টাকা জমা পরেছিল।

অবহেলায় অযত্নে বাগরাকোট বাগানের ক্রেশে বড় হচ্ছে শিশুরা

লিজ রিভার চা বাগান

মালবাজার মহকুমার গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের 'লিজ রিভার' চা-বাগানের চা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের বাগানটি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান ডি.বি.আই.টি.এ. এর অন্তর্ভুক্ত। বাগানের ম্যানেজারিয়াল স্টাফের সংখ্যা ৮ জন। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ডুয়ার্সের বাগানের খুবই সামান্য পরিমাণ চা রফতানি করেছিলেন তাঁরা। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে তাঁদের লক্ষ্য ১০ লক্ষ কেজি সিটিসি চা রফতানি করা। রফতানির জন্য নির্দিষ্ট গুণগত মান বজায় রেখে চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনে রেনফরেস্ট অ্যালায়েন্সের মতো উপদেষ্টার সাহায্য নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

লিজ রিভার চা বাগানে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৫টি। চা বাগানের আয়তন ১০২৯.৪৩ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদক্ষেত্র ১০২৯.৪৩ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমি নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদক্ষেত্র ৫২.০৬ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৬৩৪.৬১ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদীক্ষেত্র ৬৩৪.৬১ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২০৭৩ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

লিজ রিভার চা বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ১১২ জন। করণিক ১৪ জন। ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ১৮ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ১০৮৩। মোট জনসংখ্যা ৭১৮৯। স্থায়ী শ্রমিক ১৫৩৪ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ৪৫ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৫১ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নেই। কম্পিউটার অপারেটর ২ জন। সর্বমোট সাবস্টাফ ১১২। ক্ল্যারিকাল, টেকনিকাল শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩২। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৭৮০ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৫৪০৯। লিজ রিভার চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৫৪-৫৫ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা ১১-১২ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ দুই থেকে আড়াই লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ ১৩-১৪ লাখ কেজি। উৎপাদিত

চা প্যাকেট করা হচ্ছে ডানকানস গোয়েঙ্কার বাগরাকোট ফ্যাক্টরিতে

চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক। লিজ রিভার বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে উন্নতমানের বাগান। লিজ রিভার টি গার্ডেন এস.জি.আর. ওয়াই. বা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস.-এর সুবিধা পায়। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি দায়বদ্ধ নয়। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স এবং চা বিক্রয় বাবদ আয় থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার দি ম্যানেজার, ফুলবাড়ি টি গার্ডেন, পাতিবাড়ি টি গার্ডেন এবং গ্যান্ডাভিল টি গার্ডেন। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ২০২৬-২০২৭।

লিজ রিভার চা বাগানে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ১০০৬ বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাসের সংখ্যা ৫৩। মোট শ্রমিক আবাস ১০৬৭। মোট শ্রমিকসংখ্যা ১৭৮০। বাগানে শতকরা ৯০ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। নতুন পাকা বাসগৃহের জন্য বাগানের বাৎসরিক গড় খরচ ১৩ লাখ টাকা। শ্রমিক আবাসন নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় ব্যয় ১৩ লাখ। লিজ রিভার চা বাগানে শৌচাগারের সংখ্যা ৭৮৪। বাগানে বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে আবেদনের তারিখ ১৩/১২/২০০৫। কোটেশন গৃহীত হওয়ার তারিখ ২৩/০৩/২০০৮। ব্যক্তিগত মিটারযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া শ্রমিক আবাসগৃহের সংখ্যা ১০০৬।

লিজ রিভার চা বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা ১টি। ডিসপেনসারির সংখ্যা ১টি। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৮টি, ফিমেল ওয়ার্ড ৮টি, আইসোলেশন ওয়ার্ড ৬, মেটারনিটি ওয়ার্ড ৮টি। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারও আছে। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে বছরে ৩০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। বাগিচায় ডাক্তার আছে, ডাক্তারের নাম ড. কে কে ভৌমিক। আবাসিক ভিত্তিতে তিনি বাগিচায় নিযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিবিএস। প্রতিষ্ঠানের নাম নর্থ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ, রেজিস্ট্রেশন নং ৪৫৭৩৮। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত। নার্সের সংখ্যা ২ জন। নার্সরা প্রশিক্ষিত। কম্পাউন্ডার ১ জন। স্বাস্থ্য সহযোগী ১ জন। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ করা হয়। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয়। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়। মেটারনিটির সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকদের বাৎসরিক গড় ১৪ জন। লিজ রিভার চা বাগানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার অজয় সাহা ২/৩/১৯৯২ সালে বাগানে কাজে যোগ দেন।

বাগানে ক্যান্টিন আছে। ভরতুকি দেওয়া হয় না। খাদ্যদ্রব্যের বা সামগ্রীর দাম বোর্ডে দেওয়া হয় না। বাগিচায় ক্রেশের সংখ্যা ৩টি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শৌচাগার আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয়। পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ৬ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা ১টি বাস। বাগানে বিনোদনমূলক ক্লাব আছে, খেলার মাঠ আছে।

লিজ রিভার টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে, কোনও বকেয়া নেই। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই। রেশন বকেয়া নেই। শ্রমিকদের জ্বালানী/চপ্পল/ছাতা/কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বিগত চার বছরে ৬৫ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। বছরে গড়ে ৫৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন।

বিশ্বজুড়ে চা পানের অভ্যেস বৃদ্ধির সঙ্গে চায়ের বাজারে নানা দেশের তৈরি চায়ের চাহিদা বাড়ছে। সঙ্গে বাড়ছে প্রতিযোগিতাও। আপাতত ব্রিটেন, জার্মানি, জাপান, আমেরিকায় চায়ের ব্যবসায় নেমেছে গুডরিকস। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা সিইও অরুণ এন সিংহের সঙ্গে গুডরিকসের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলাপচারিতায় জানা গেল গুডরিকস চিন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির বাজারেও তৈরি চা নিয়ে হাজির হয়েছে। লক্ষ্য

গুডরিকসের লিজ রিভার টি গার্ডেন ফ্যাক্টরি

সার্বিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওই চায়ের বাজার ধরা। সেই কথা মাথায় রেখেই উত্তরবঙ্গে তৈরি চায়ের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নতুন করে লগ্নি করছে সংস্থা। এর ফলে কারখানাগুলির উৎপাদন ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়বে বলে দাবী কোম্পানির। আধুনিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রথাগত চায়ের পাশাপাশি প্যাকেটজাত চায়ের উৎপাদনেও নজর দিচ্ছে গুডরিকস এবং দু'বছরে তা ২৫ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারা। এখন বছরে ৮০ লক্ষ কেজি প্যাকেটজাত চা তৈরি হয়। তা বেড়ে হবে এক কোটি কেজি। ব্যবসার বিপণনেও ১০ কোটি টাকা খরচ করা হবে। এখন গুডরিকস গোষ্ঠীর হাতে ১৭টি চা বাগান আছে। এর মধ্যে ১২টি ডুয়ার্সে, দার্জিলিঙে ৩টি, ২টি আসামে। আসামে আরও দু-একটি বাগান কেনার ইচ্ছে গুডরিকসের। কর মিটিয়ে গুডরিকসের ব্যবসার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৭৪২৭ কোটি টাকা। মুনাফা হয়েছে ১২৮.৯০ কোটি। ৪০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে গুডরিকস।

লিজ রিভার টি গার্ডেন হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুনাম আছে

আর ডানকানস সেখানে রচনা করেছে মৃত্যুমিছিল। ডানকানস গোয়েঙ্কাদের বৃহত্তম পরিকাঠামোযুক্ত বাগরাকোটসহ অন্যান্য বাগানগুলিতে যে পরিমাণ শ্রমিক শোষণ এবং অনাচার, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, বৈষম্যের অভিযোগ পেলাম এবং স্বচক্ষে দেখলাম তার চিত্র 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাতায় তুলে না ধরলে আম আদমির কাছে শোষণের এই চিত্র কোনও অবস্থাতেই ধরা পড়বে না। ডানকানস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বাগরাকোটসহ অধিকাংশ বাগানেই প্রবল অনিশ্চয়তা। কারণ ডানকানস কোম্পানির অধিকাংশ বাগানই রুগ্ন হিসাবে বিআইএফআর-এর তালিকাভুক্ত। চা বলয়ের শ্রমিক কর্মচারী এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির সন্দেহ ছিল দীর্ঘকালীন আর্থিক দুর্নীতির কারণেই এই রুগ্নতা। তাদের আশংকা ছিল কোম্পানি চা-বাগানগুলি থেকে প্রাপ্ত মুনাফার অর্থ এক বা একাধিক অন্য ব্যবসাতে লাগিয়েছে। সেখানে আর্থিক ভরাডুবি হয়েছে এবং তার ফল ভুগছেন চা-বাগানের শ্রমিক কর্মচারীরা।

রাজনগরের গ্ল্যামার ফেরাতে পারবেন নতুন পুরপ্রধান?

বিশেষ প্রতিবেদন

এবারের রাসমেলার মধ্য দিয়েই নাকি অভিষেক হল রাজার শহর কোচবিহারের নতুন পুরপিতার? দীর্ঘ পঁচিশ বছরের কুন্ডু যুগের অবসানের সাক্ষ্য হিসেবেই একদিন নাকি এই ঐতিহ্যময় শহরের ইতিহাস লেখার সময় অবশ্যই উল্লেখ করা হবে সেই সত্য? পুরবাসীর একাংশ তো সেই অভিমতই ব্যক্ত করছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই প্রথম কোচবিহারের পুর ক্ষমতা আসল তৃণমূলীদের হাতে গেল, রাজ্যে ক্ষমতায় আসবার ছ'বছর বাদে। শহরের রাজনৈতিক মহল অনেকটা নির্ভয়ে মুখ খুলছেন, এতদিন 'মুকুল থিওরি'তে তৃণমূলের জার্সি পরে কোচবিহার পুরসভা চালাত অন্যরা, মুকুল ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি এই বদল আসা সম্ভব হয়েছে! গত বছরের বিধানসভা নির্বাচনে এবং লোকসভা উপনির্বাচনে জয়ের ব্যবধান অস্বাভাবিক বেশি থাকলেও শহরে এগিয়েছিল বিরোধীপক্ষই— যার অর্থ হল কোচবিহারের নির্বিবাদী নাগরিক পুর পরিষেবায় দীর্ঘদিনের অবহেলার নিঃশব্দে উত্তর দিয়েছেন ভোটের বাক্সে। শহরের মানুষ যদিও আজ আর নতুন করে আশাবাদী হওয়ার অপেক্ষা রাখেন না, তবু নতুন পুরপিতা ভূষণ সিং-কে নিয়ে আপাতত কোনও মহলেই খুব একটা আপত্তি নেই। শহরের বুদ্ধিজীবি মহল বলছেন, উনি ইনিংস শুরু করেছেন ভাল, তাছাড়া নিজের এলাকায় জনসংযোগ ও জনপ্রিয়তার ধারাবাহিক ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে ওনার।

প্রথমবার স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতেও বিশাল রাসমেলার আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ ঠিকঠাকই ছিল বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন শহরবাসী। কিন্তু ওনার শুভানুধ্যায়ীরাও স্বীকার করছেন, শহরের পরিচ্ছন্নতা-সৌন্দর্য্য অবলুপ্তির পথে, রাস্তাঘাটের নিয়মশৃঙ্খলা আজ নিয়ন্ত্রণহীন, পুর আইনকানুন শিকেয়, দূষণ আজ মাত্রাছাড়া। যে নজির এখন উত্তরের কোনও জেলা শহরে নেই, বরং অনেক জায়গাতেই ঠিক উল্টো তকতকে ছবি। কর্মসূত্রে কোচবিহারে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যাওয়া জনৈক উচ্চপদস্থ আমলার ব্যক্তিগত মত হল, গত তিন দশক ধরে অবক্ষয়ের লুম্পেন সংস্কৃতি গ্রাস করেছে কোচবিহারকে, যার দায় এড়াতে পারেন না এখানকার তাবড় নেতানেত্রীরা। আজ কেউ একা এসে সেই অবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলে তা করা খুবই কঠিন। তিনি উদাহরণ দিলেন, যেমন এসেই প্রাণপণে দীর্ঘদিনের জমা জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে হাত দিয়েছেন পুরপ্রধান, কিন্তু একই সঙ্গে প্রয়োজন ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং নগরবাসীর সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ, না হলে বেশিরভাগটাই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। কোচবিহারের প্রেমে পড়ে যাওয়া সেই আমলাসাহেবের প্রস্তাব হল, শহরের যে ক্লাবগুলিকে বছর বছর টাকা দেন সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁদেরকে কাজে লাগানো যেতেই পারে। আর প্রশ্ন যখন উন্নয়ন, নেতারা চাইলে তাদেরকে এ নিয়ে বাধ্যও করা যেতে পারে, তাই না?

নতুন পুরপিতা ভূষণ সিং

> প্রথমবার স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতেও বিশাল রাসমেলার আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ ঠিকঠাকই ছিল বলে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন শহরবাসী। কিন্তু শুভানুধ্যায়ীরাও স্বীকার করছেন, শহরের পরিচ্ছন্নতা-সৌন্দর্য্য অবলুপ্তির পথে, রাস্তাঘাটের নিয়মশৃঙ্খলা আজ নিয়ন্ত্রণহীন, পুর আইনকানুন শিকেয়, দূষণ আজ মাত্রাছাড়া। যে নজির এখন উত্তরের কোনও জেলা শহরে নেই, বরং অনেক জায়গাতেই ঠিক উল্টো তকতকে ছবি।

ক্লাবগুলি কিন্তু সোৎসাহে রাজি! অন্তত গোটা চারেক মাঝারি সাইজের ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় সেইরকম মনোভাবের লক্ষণ মিলল। তাঁরাই প্রস্তাব দিলেন, এ নিয়ে ক্লাবগুলির মধ্যে বড়সড় প্রাইজের কম্পিটিশন করা যেতে পারে— 'সেরা সাফাই অভিযান'। তাঁদের বক্তব্য, নেতাদের লড়াই নিজেদের মধ্যে থাকুক না, অত ঐক্য-টৈক্য দরকার নাই, কিন্তু নিজেদের শহরকে আলাদা আলাদা করেই না হয় ভালবাসলেন! তাঁরা মানলেন, সংস্কৃতির চর্চা শহরে তলানিতে এসে ঠেকেছে, সংস্কৃতিপ্রেমীর সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, ক্লাবগুলি সেই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। যেমন বিয়ের মরসুমে রবীন্দ্র ভবনে কোনও প্রোগ্রাম করাটা নাকি বোকামির পর্যায়েই পড়ে, কারণ সে সময় দর্শক মেলা কঠিন! কিন্তু তাঁদের পাল্টা দাবি, শহরে ডজনখানেক বা তার বেশি নাটকের গ্রুপ আছে, প্রায় সবাই কমবেশি সরকারি অনুদানপুষ্ট, শীত পড়লেই শুরু হয়ে যায় উৎসবের ঘনঘটা, নাগরিক চেতনা জাগরণে তাঁদেরকেও কাজে লাগানো যায়! বলাই বাহুল্য, নাট্যসংস্থাগুলিরও আপত্তির প্রশ্ন নেই।

'প্রস্তুত সবাই আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু শুরুটা করতে হবে যে তাঁকেই। তার জন্য প্রয়োজন আপৎকালীন এক্সপার্ট কমিটি

যাঁরা মূলত মগজাস্ত্রের সাহায্যে পরিকল্পনা করে দেবেন, আর তারপর দরকার কুইক অ্যাকশন কমিটি'। ডুয়ার্সের অন্যান্য পৌরসভার একাধিক কর্তাব্যক্তি কোচবিহারের নয়ানিযুক্ত পুরপিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এছাড়াও যা বললেন তা হল, শহর পুনরুদ্ধারের সৎ উদ্দেশ্য থাকলে ভূষণবাবুকে আপাতত অন্য সব নেতাদের শরণাপন্ন হতে হবে নিঃশর্তে, কারণ উন্নয়নের জন্য চাই অর্থের যোগান । তার জন্য প্রয়োজনে মানুষের দোরে দোরে ঘুরতে হবে, তাদেরকে নিয়ে দল বেঁধে পৌঁছতে হবে বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রীর কাছে। রাসমেলার মাঠে চাই স্থায়ী ফ্লাডলাইট? সীমানা বরাবর পায়ে হাঁটা পথ? ছোট ছোট ঝাউ-দেবদারুর সারি? দিঘিগুলির সংস্কার? আরও অনেক চিলড্রেন পার্ক? সুলভ শৌচালয়? ক্যাফেটেরিয়া? মল নয়, চাই দার্জিলিঙের মত ম্যাল? এসবের জন্য চাই অনেক অনেক টাকা। জলপাইগুড়ি শহরে সেদিন শাসকদলের এক প্রবীণ নেতা এই প্রসঙ্গে বললেন, 'সিওবি' অর্থাৎ এই কোচবিহারকে একটা সময় আমরা বলতাম 'সিটি অব বিউটি', আজ সে সব 'বিউটি' তোর্ষার জলে ভেসে গিয়েছে। তাঁরই মূল্যবান পরামর্শ, আজ সেই বিউটি ফিরিয়ে আনতে গেলে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে টোটো-ট্রেকার-ম্যাক্সি চালকদের ইউনিয়নগুলি যারা চালায় সেইসব স্বঘোষিত 'নেতাদের'। ট্রাফিক নিয়মকে কাচকলা দেখিয়ে চলাফেরার এমন রামরাজত্ব যে উত্তরের আর কোনও শহরে নেই তা একবাক্যে মানে 'অপদার্থ' আখ্যা পাওয়া

> **শহর পুনরুদ্ধারের সৎ উদ্দেশ্য থাকলে ভূষণবাবুকে আপাতত অন্য সব নেতাদের শরণাপন্ন হতে হবে নিঃশর্তে, পৌঁছতে হবে বিধায়ক-সাংসদ-মন্ত্রীর কাছে। কারণ উন্নয়নের জন্য চাই অর্থের যোগান।**

সিভিক পুলিশ ভলান্টিয়াররা। ইউনিয়ন পাণ্ডাদের একটু ঘুরেফিরে দেখে বুঝতে হবে যে 'ডিসিপ্লিন' রক্ষার দায়িত্ব কখনই পুলিশের একার হতে পারে না, আর কামাই ধান্দার জন্য 'বেসিক ডিসিপ্লিন' জলাঞ্জলি দেওয়াটা মুর্খামি, যে মুর্খামিকে একদা প্রশ্রয় দিয়ে পস্তাতে হয়েছে এ রাজ্যের বাম নেতাদের।

কঠোর হয়ে নিয়ম বেশিদিন টানা যায় না, কৌশলী হয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটাই যে বুদ্ধিমানের, এই মন্ত্রেই সম্ভবত বিশ্বাসী ভূষণ সিং। তাঁর সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্তে অন্তত সেরকম ইঙ্গিতই মিলেছে বলে ধারণা শহরের একাধিক পুরপ্রতিনিধির, প্রাক্তনীদেরও। পথঘাট সব ভেঙেচুরে শোচনীয়, দায়িত্ব পূর্ত্ত দপ্তরের হলেও, নাজেহাল নাগরিকের বিচারে তার দায় ভুগতে হয় পুরসভাকেও। কেননা তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বেসামাল ট্রাফিক, সীমাহীন ধুলো-কাদা ও চলাফেরার যন্ত্রণা। নর্দমা সাফাই, প্লাস্টিকের বাড়াবাড়ি ব্যবহার আটকানো, মোড়ে মোড়ে ভ্যাট স্থাপন ও দৈনিক ক্লিয়ারেন্স এই রুটিন কাজগুলি যা অন্যান্য পুরসভায় আজকাল অতি স্বাভাবিক সেগুলিকে এখানে নিয়মিত করাটাই হবে ভূষণবাবুর প্রাথমিক সাফল্য। আর সবশেষে যেটা করলে পুরসভার দীর্ঘদিনের অস্বচ্ছ ইমেজ খানিক পরিষ্কার হত তা হল মাঝেমাঝেই আয়-ব্যয়ের নানা হিসেব জনসমক্ষে তুলে ধরা। যেমন রাসমেলার হিসেব, টোল গেটে তোলা অর্থের হিসেব ইত্যাদি। অনুমান নিস্প্রয়োজন, নিজের দল ও শহরের ভোটারদের শংসাপত্র পেতে গেলে আগামী দিনগুলি বেশ কঠিন কাটবে তাঁর। রাসমেলা নির্বিঘ্নে উতরেছেন, মদনমোহন দেবের আশীর্বাদ শেষ অবধি তাঁর উপর কতটা বর্ষায় তা বলবে সময়।

মাল পৌরসভার পৃষ্ঠপোষকতায় | ডামডিম যুব নাট্য সংস্থার সহযোগিতায়

মাল অ্যাক্টোওয়ালা আয়োজিত
৭বর্ষ মাল নাট্যোৎসব

স্থান- রবীন্দ্রভবন, সুভাষিণী বালিকা বিদ্যালয়, মাল
১৬ থেকে ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

অনুষ্ঠান শুরু প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.
অনুষ্ঠান সূচী
শুভ উদ্বোধন ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭
সময়ঃ সন্ধ্যা ৫.৩০ মিঃ

আসুন সবাই মিলে নাটক দেখি

তারিখ	নাটক
১৬ই ডিসেম্বর ২০১৭	১ম নাটক ডার্ক Room — নাটক ও নির্দেশনা - পূর্বাচল দাশগুপ্ত, পরিবেশনা - কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ, কোচবিহার
	২য় নাটক চেনা মানুষ — নাটক- শান্তনু মজুমদার, নির্দেশনা- সিন্টু দত্ত, পরিবেশনা - সজ্জশ্রী যুব নাট্য সংস্থা, আলিপুরদুয়ার
	৩য় নাটক জটিলেশ্বর — নাটক- শ্যামল চন্দ নির্দেশনা- পল্লব বসু, পরিবেশনা - ওপেন সিক্রেট, শিলিগুড়ি
১৭ই ডিসেম্বর ২০১৭	১ম নাটক রাজার পোশাক — নাটক ও নির্দেশনা - সুধাংশু বিশ্বাস, পরিবেশনা - ডামডিম যুব নাট্য সংস্থা, ডামডিম
	২য় নাটক হঠাৎ দেখা — নাটক ও নির্দেশনা-গৌতম দত্ত, পরিবেশনা - ডুয়ার্স ক্লাব, সলসলাবাড়ি, আলিপুরদুয়ার
	৩য় নাটক বৃত্ত — নাটক- চন্দন ঘোষ নির্দেশনা- সুব্রত চক্রবর্তী, পরিবেশনা - সমকালীন সংস্কৃতি, কোলকাতা
১৮ই ডিসেম্বর ২০১৭	১ম নাটক আশ্রয় — নাটক ও নির্দেশনা - সুধাংশু বিশ্বাস, পরিবেশনা - মাল অ্যাক্টোওয়ালা, মাল
	২য় নাটক সেথুয়া — নাটক- শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, নির্দেশনা- তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশনা- গাজোল বিষান, মালদা
	৩য় নাটক বাঘ বাবাজী — নাটক- শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, নির্দেশনা- অভিজিৎ নাগ, পরিবেশনা - উদীচী নাট্য সংস্থা, জলপাইগুড়ি

উদ্বোধকঃ শ্রী অমলেন্দু বিশ্বাস পশ্চিম ডুয়ার্সের অতীতের বিশিষ্ট অভিনেতা ও প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Contact 9830410808

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

বাইরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা আজকাল অনেক স্বচ্ছন্দ

তবু একইরকম মিস করে নিজের ডুয়ার্সভূমি!

২০০৯ সালের ডিসেম্বরের ভরা শীতের দুপুরে এক উৎসব উদ্বোধনে এসেছিলেন উত্তরবঙ্গের কন্যা এবং সুলেখিকা শ্রীমতি তিলোত্তমা মজুমদার। উৎসব কমিটির ফাঁকা অফিসে অনেকটা সময় তিলোত্তমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। তার পড়াশোনা, বড় হয়ে ওঠা চা-বাগানের পরিমণ্ডলে। খুবই প্রত্যন্ত এলাকায়। স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতায় গিয়েছিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য। উত্তরবঙ্গের বাহালিদের কথায় একটা নিজস্ব টান আছে— সেটা নিয়ে দক্ষিণের বিদ্রূপ কখনও পীড়নের সমতুল হয়ে ওঠে। খাদ্য খাওয়া, যাতায়াত, সহপাঠীদের প্রাথমিক অসহযোগিতা প্রথমে যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল। ধীরে ধীরে মানিয়ে নিয়েছিলেন, নিজেকে বুঝিয়েছেন নিজেই— 'ভবিষ্যত তৈরি করতে হলে এমন সব অসুবিধে আমল দিলে চলবে না'। কিছুদিনের মধ্যেই তার কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে। সাহিত্য জীবনের শুরুতে এমন অনেক বাধা এসেছে, নিজেই তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে তা সামলেছেন। এখন সাহিত্য ভুবনের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

প্রতিবছর অনেক ছাত্রছাত্রী স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, ভুবনেশ্বর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি ইত্যাদি জায়গায় নামী কলেজে ভর্তি হয়। সবাই যে হস্টেলে থাকতে পারবে এমন ব্যবস্থা সব কলেজে নেই। কলেজ হস্টেলে

জায়গা না পেলে মেয়েদের সমস্যা আরও বেশি। অভিভাবকরা মেয়েদের সুরক্ষার জন্য চিন্তায় থাকেন। তাছাড়া একটু রাতে প্রয়োজন হলেও বাইরে যেতে নানা বাধা নিষেধ থাকে।

প্রথমে কলকাতায় গিয়ে যারা ভাড়া বাড়িতে থাকছে এমন কয়েকটি মেয়ের কথা বলব। এমন মেয়েদের তিনভাগে ভাগ করা যায়, (১) ভাড়া বাড়িতে দু'-চার জন একসঙ্গে থাকে; 'হোমডেলিভারি'-তে খাবার বাড়িতে দিয়ে যায়। (২) ভাড়া বাড়িতে ৬-৮ জন একসঙ্গে থাকে রান্নার লোক আছে (৩) 'পেয়িং গেস্ট' থাকলে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা নেই।

উপরের তিন বিভাগেই একটা ব্যাপার মোটামুটি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রতিটি মেয়েদের মেসবাড়িতে বাড়িওয়ালা থাকে এবং একটু কড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। জলপাইগুড়ি পান্ডাপাড়ার দেবযানী রায় যাদবপুরে ফ্রেন্ডস রো-তে একটা মেস বাড়িতে তিন জন একসঙ্গে থাকে। রাতে তাদের হোম ডেলিভারিতে খাবার আসে। নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের খাবারের কিছুটা রেখে দিয়ে সকালে কলেজ যাওয়ার আগের খাবার হয়ে যায়। অন্য সময় দুপুরে কলেজ ক্যান্টিনে ভাত বা রুটি দিয়ে কাজ সারে। জিজ্ঞেস করেছিলাম— 'সকালে হোম ডেলিভারিতে খাবার নিলেই পারো'। দেবযানী জানাল— 'যেদিন সকালে ক্লাস থাকে সেদিন ওরা খাবার পৌঁছে দিতে পারে না। তাই আমরা দুপুরে হোমডেলিভারি থেকে খাবার নিই না। দেবযানীর মেসে ঘুরে ফিরে মায়েরা এসে থাকে, তার জন্য একটা স্টিলের সিঙ্গল ফোল্ডিং খাট রাখা আছে। মায়েরা এলে বাড়িওয়ালার রান্নাঘরে মেয়েদের খাবার তৈরি করা হয়। এর জন্য গ্যাসের দাম বাবদ প্রতিদিন ২৫ টাকা হিসাবে বাড়িওয়ালার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করতে হয়। বাসনপত্র অপ্রতুল। কাজেই এক-দুই পদেই রান্না সারতে হয়। ইলেকট্রিক কেটলিতে চা, জল গরম, ডিম সেদ্ধ বা ম্যাগিও বানানো হয়। অনেক সময় শীতকালে গরমজলের প্রয়োজনে ওই ইলেকট্রিক কেটলি খুব কাজে লাগে। মেয়েদের কারও শরীর খারাপ হলে অনেক বাড়িওয়ালা যত্ন নেন। শুনে খুব ভাল লাগল সপরিবারে বাড়িওয়ালা ওই তিন কন্যাকে

দেবযানী ও তার সতীর্থ মেঘমালা প্রথম যেদিন রাতে যাদবপুর রেল স্টেশন থেকে শিয়ালদহ এসে প্ল্যাটফর্ম পাল্টে দার্জিলিং মেলে উঠেছিল, সেদিন পথে একটু ভয় ভয় ভাব হয়েছিল। এনজেপি-তে মেঘমালা নেমে গেলে দেবযানী ট্রেন পরিবর্তন করে জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমেছিল। বাবা এনজেপি-তে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবযানী মানা করেছে। ট্রেন সেদিন যখন জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাল, তার মনে হয়েছিল সে বড় হয়ে গিয়েছে, নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে, সামলে চলতে পারবে। বাবা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, বাবাকে দেখে চোখের জল বাঁধ মানেনি।

একসঙ্গে নিয়ে কিছুদিন আগে 'পোস্ত' সিনেমা দেখেছেন। তাছাড়া বাড়িউলি হাঁটুতে ব্যথা সত্বেও মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে শপিং মলে কেনাকাটা করতে যান। দেবযানী ও তার সতীর্থ মেঘমালা (শিলিগুড়ি বাবুপাড়ার বাসিন্দা) প্রথম যেদিন রাতে যাদবপুর রেল স্টেশন থেকে শিয়ালদহ এসে প্ল্যাটফর্ম পাল্টে দার্জিলিং মেলে উঠেছিল, সেদিন পথে একটু ভয় ভয় ভাব হয়েছিল। এনজেপি-তে মেঘমালা নেমে গেলে দেবযানী ট্রেন পরিবর্তন করে জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমেছিল। বাবা এনজেপি-তে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেবযানী মানা করেছে। মেঘমালা একটি বেসরকারি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে আইটি নিয়ে পড়াশোনা করে— একটু অর্থের টানাটানি আছে কিন্তু বন্ধুরা নানাভাবে অপ্রত্যক্ষ সাহায্য করে। দেবযানী বলছিল ট্রেন সেদিন যখন জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাল, তার মনে হয়েছিল সে বড় হয়ে গিয়েছে, নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে, সামলে চলতে পারবে। বাবা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, বাবাকে দেখে চোখের জল বাঁধ মানেনি।

জলপাইগুড়ি সেন্ট পলস স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে ঋক এবছরের মাঝামাঝি কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে। ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রথম বর্ষের ছাত্র। ভর্তি হয়েছে বাইপাসের বেশ ভেতরে হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-তে। ঘর ভাড়া নিয়েছে যাদবপুর, সুলেখা স্টপেজের কাছে। ভাড়া মাসে ৩৮০০ টাকা। সঙ্গে থাকে স্কুলের বন্ধু শ্রীমান শুভজ্যোতি ঠাকুর। ও অবশ্য অন্য কলেজে ভিন্ন বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। দোতলায় ওরা থাকে, নিচের তলায় বাড়িওলা। ঋকের বাবা ও মা দু'জনেই সরকারি কর্মচারী ছিলেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। ভয়ানক আদুরে। জিজ্ঞেস করেছিলাম— 'কেমন লাগছে কলকাতার জীবন?' ঋক অকপটে বলেছে— 'আমি বেজায় হোম সিক। প্রতি মুহূর্তে বাবা-মাকে মিস করি, জলপাইগুড়ির জন্য মন খারাপ লাগে।'

ওদের ঘরে দুটো তক্তপোষ, একটা সিলিং ফ্যান ও একটা টিউব লাইট। আর কোনও আসবাবপত্র নেই। ওদের দরকারও হয় না। বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, হোমডেলিভারি ব্যয় বহুল। ওরা হোটেলেই পছন্দ মতো খায়। একটু তেলমশলা বেশি থাকে হোটেলের রান্নায়। ঋক বাড়ির খাবারও খুব মিস করে। আসলে ছাত্রজীবনে বাড়িতে অনেক সময় খাওয়া নিয়ে আব্দার করা যায়। সেই আব্দার বাবা-মা রক্ষাও করেন। ওরা যেন শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারে না— মা কতদিন ভাত মেখে খাইয়ে দেয়। এসব স্মৃতি ঋকের মনেও উজ্জ্বল। ওদের ওই ভাড়াবাড়িতে বাবা-মা যদি আসেন, তবে তাদের থাকার ব্যবস্থা আছে এটা একটা বাড়তি সুবিধা। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে বাড়ির কর্তাকে বলে যেতে হয়। না বলে গিয়ে, ফিরতে দেরি হলে তার পরিণতি ঋকের জানা নেই। কারণ এমন কিছু তারা এখনও করেনি।

মানুষজনের ভিড়, অফিস টাইমে বাসে দমবন্ধ অবস্থা, বিস্বাদ জল, বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল, ডেঙ্গির আতঙ্ক; এসব মানিয়ে নিতে সময় লাগবে— জীবন থেমে থাকে না। দু' একজন দুষ্টু সিনিয়ার দাদা হালকা র‍্যাগিংয়ের মতো টীকা টিপ্পনী কাটলেও সবটাই মজার। এখন দুই বন্ধু বাড়ির ফোনের অপেক্ষায় থাকে— ওটাই শুষ্ক জীবনের ওয়েসিস। মা-বাবা ফোন করতে দেরী করলে নিজেরাই ফোন করে। মায়ের গলা শুনলে সারা দিনের সব গ্লানি দূর হয়ে যায়। ঋক ও শুভ্র ব্যাগ গুছিয়ে বাবার সঙ্গে কলকাতায় থাকার জন্য যেদিন বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন কিন্তু জীবনের আর একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল। ওদের যে বিষয়ে পড়াশোনা চলছে, তাতে করে ওরা আর জলপাইগুড়িতে বাস করতে ফিরে আসবে না। জীবনের ইঁদুর দৌড়ে ওদের জীবন তরী কোথায় নোঙর ফেলবে, তা ভবিষ্যতই বলবে।

শুধুমাত্র একটা ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বোপরি যদি থাকার ব্যবস্থা সুরক্ষিত থাকে অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে আশ্রয় পেলে ছাত্রছাত্রীরা ও তাদের অভিভাবকরা কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। আজকাল বেশ কিছু প্রাইভেট কলেজের হোস্টেল যেমন ব্যয়বহুল তেমনই সুব্যবস্থা সেখানকার থাকা, খাওয়াদাওয়া, লাইব্রেরি ইত্যাদির । ডোনা রায়ের প্রাথমিক পড়াশোনা হলদিবাড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষক, মা গৃহকর্ত্রী। ডোনা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তার পড়ার জন্য পুরো পরিবার জলপাইগুড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে আসে এবং ডোনাকে সদর গার্লস স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করে। খুবই আমুদে ভাল মনের মেয়ে। পড়াশোনা ছিল মাঝারি মানের। এবছর ভুবনেশ্বরে বি.এস.সি (নার্সিং) পড়তে গেল। প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভাল মানের হোস্টেল। পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলো ও আমোদের ভাল ব্যবস্থা।

প্রতিদিন বাবার সঙ্গে ভিডিও কলিং-এ লাইভ কথাবার্তা হয়। মা সুযোগ পেলেই ফোনে কথা বলেন। তবুও ডোনা বাড়ি ছেড়ে, চেনা পরিবেশ ছেড়ে বেশ দূরে থাকার কারণে মন খারাপ করে। তবে হস্টেলের খাওয়াদাওয়া ডোনার 'না পসন্দ'। অল্পস্বল্প অভিযোগ করত। অত্যন্ত দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে। চট করে বাড়ি আসা যায় না। তাছাড়া ওর বাবা-মা একা ডোনাকে যাতায়াত করতে দেবে না। আরও দু'-একজন স্থানীয় পরিচিত মেয়ে ডোনার সঙ্গে একই কলেজে পড়ে, এটাতে দূরদেশে ডোনার বেশ সুবিধা হয়েছে। এখন একটা ছোট সমস্যা আছে— ক্লাসের পড়াশোনার মাধ্যম মূলত ইংরাজি। এটা বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের বাইরে পড়তে গিয়ে ভোগান্তি হয়। তবে দু'-তিন মাসের মধ্যে এই অসুবিধা দূর হয়ে যায়। ইংরাজিতে ক্লাস নোট নিতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই তো সেদিন ওদের কলেজে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন। এত বড় মাপের মানুষকে কাছ থেকে দেখেও আপ্লুত হয়েছিল। ওদের দিন ভালই কাটছে।

এবার ঋভুর কথা। ঋভু চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ি। বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ কর্মচারী, মা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজি পড়ান। ঋভু, পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান তবে আদুরে গোপাল নয়। দিদিমা-ঠাকুমার চোখের মণি।

ঋভু ও বন্ধুরা

এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে কলকাতার নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সুখপ্রদ ছিল না। কলেজ জীবনের শুরুতেই ঝটকা। বন্যায় ভেসে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ, ট্রেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কাজেই তাকে বায়ুপথে কলকাতা যেতে হয়েছে। প্রথম বিমান সফর। কলেজের অবস্থান কলকাতায় গড়িয়া স্টেশনের কাছেই একটা গ্রামে। স্টেশনের ওপার থেকে অটো চলছে ওদের কলেজ পর্যন্ত। যাতায়াতের অসুবিধে নেই। আশপাশের বাড়িগুলো কয়েক শত ছাত্রছাত্রীর মেস বাড়ি। ঋভু যে বাড়িটায় থাকে, সেটা তিনতলা। একুশ জন ছাত্র থাকে। নিচের তলায় একটা ঘরে ওরা দু'জন থাকে। ঘর আসবাবপত্রের বাহুল্য বর্জিত। দু'জনের দুটো তক্তপোশ, একটা সিলিং ফ্যান ও টিউব লাইট। তবে সকালের টিফিন, দুপুর ও রাতের ভাতসহ মাসে খরচ ছ' হাজার টাকা। খাবারের মান তুচ্ছ করার মতো নয়। এখানে মোটামুটি অভিভাবকহীন জীবন, রাত দশটার মধ্যে ফিরলেই চলবে। ঋভু নিজেকে সামলে চলতে জানে। ইদানিং কাছেই একটি জিমে যাচ্ছে। কলেজে পড়ার চাপ আছে, কাজেই বাইরে ঘোরাফেরার উপায় নেই। ওদের কলেজ বা মেস যে জায়গায়, সেখানে কলকাতা বর্ণ-গন্ধ পুরোপুরি অনুপস্থিত। তাই ছুটির দিনগুলোয় একটু শহর বেড়িয়ে আসা।

আমি ঋভুকে প্রশ্ন করেছিলাম— 'তুই কি জলপাইগুড়ির বাড়ি বা শহরটাকে মিস করিস?' গলার স্বর কেঁপে গেল কিন্তু বলে উঠল, 'নানা তেমন কিছু নয়'। অমন আদরের একটি উনিশ বছরের কিশোর যতই স্বাবলম্বী হোক না কেন— সময়ে অসময়ে বাড়ির কথা মনে পড়বেই। তাই তো গলার স্বর কেঁপে ওঠে। পুজোয় দল বেঁধে ঘোরা, শীতে পিকনিক, তিস্তা নদী, তুমুল বৃষ্টি ও হাঁড় কাঁপানো শীতকাল মনে পড়বেই।

শহরের পরিচিত একটি মেয়ে সংযুক্তা মজুমদার ভূগোলে অনার্স করে আর মাস্টার্স করার কথা মনে আনেই নি। শিক্ষকতা সে করতেই চায় না। সরকারি দপ্তরে পদস্থ কাজ করতে চায়। গ্র্যাজুয়েশনের পর তাই কলকাতা যাত্রা। বেলঘরিয়াতে একটা ওয়ান বি.এইচ.কে ফ্ল্যাট বাড়িতে সহপাঠিনী শ্বেতা মহন্তর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বাস করে। সেখান থেকে দশ মিনিটের দূরত্ব পার করলে একটি সেন্টারে পাঠ নিয়ে সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরি করছে। সংযুক্তার পিতা ছিলেন স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী। একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হয়েছেন। বাবার চিকিৎসার সেই সময়ে দীর্ঘদিন তাকে দিল্লিতে থাকতে হয়েছে। কখনও একা চলাফেরা

ভুবনেশ্বরে পাঠরতা ডোনা রায়

করতে হয়েছে। মা ও ছোট ভাইকে সামলাতে কত সময় ব্যস্ত থেকেছে। তার সেই সঙ্কটপূর্ণ ক্ষণে সে পৃথিবীকে চিনতে শিখেছে। গ্র্যাজুয়েশন লেভেল পড়াকালীন সে ৪৫ কিমি দূরে শিলিগুড়িতে একাই টিউশন করতে গিয়েছে। ওই অল্পবয়সেই মানসিকভাবে দৃঢ়তা অর্জন করেছিল। আজ কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকতে, একা যাতায়াত করতে, দক্ষিণবঙ্গের সতীর্থদের সঙ্গে টক্কর দিতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

আমাদের সময় অর্থাৎ ষাটের কিংবা সত্তর-আশির দশকে এমনকি তিলোত্তমাদের প্রথম কলকাতা জীবনের প্রবেশকালেও ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন বন্দোবস্ত ছিল না। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ বাড়িতে টেলিফোনের ব্যবস্থা ছিল না। যোগাযোগ বলতে ছিল,ক্যুরিয়রে বা পরিচিত কারও হাতে পাঠানো চিঠি, বাকিটা থাকত 'ভগবানের হাতে'। মোবাইল ফোনের জমানায় এখন প্রবাসে পাঠরত সন্তানদের সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ থাকছে। ফোনেই আব্দার-অভিযোগের সঙ্গে খুনসুটিও চলছে। ছেলের সংগ্রহে কয়টি বিস্কুট আছে, লন্ড্রি থেকে জামাপ্যান্ট আনা হয়েছে কি না— সব ব্যাপারেই বাবা-মায়ের নির্দেশ আসছে। এমন কি টেলিফোনে রিং করে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার দায়িত্বও মা-বাবার। সময়ের সঙ্গে প্রবাসী জীবনের প্রাথমিক মন খারাপ অনেকটাই লাঘব হয়েছে। কিন্তু এখনও স্টেশনে ছেলে মেয়েরা ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফেরার সময় বিদায় দিতে মা-বাবা ছাড়াও আত্মীয় বন্ধুরা আসেন। মা সন্তানকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন— বলে যান 'ট্রেনে কেউ কিছু দিলে খাবি না। সাবধানে চলাফেরা করিস। খাওয়াদাওয়া ঠিকমত করিস। পারলে এক্সমাসের ছুটিতে আসিস'। রিজার্ভেশন টিকিটটা বাবা আর একবার চেক করে নেন। ট্রেন হুইসেল দেয়, ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করে। বাবা-মা, স্বজনরা পাশে পাশে হাঁটতে থাকেন। হাত নাড়িয়ে টা-টা চলতে থাকে। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যায়।

এইখানেই ওদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি নিজেরটা। একুশে পা দিয়েই কলকাতা পাড়ি, চাকরি করতে। এক বন্ধু হলদিবাড়ি থেকে আমার জন্য একটা বাঙ্ক দখল করে নিয়ে এল থ্রু কোচে। রিজার্ভেশনের বালাই নেই। ট্রেন সরাসরি কলকাতা যেত না তখন। খেজুরিয়া স্টেশনে নেমে বাক্স কাঁধে নিয়ে বালি ঠেলে গঙ্গায় নোঙর করা স্টিমারে চেপে ওপারে গিয়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠে জায়গা ধরা। তবে গঙ্গার পাড়ে শস্তার হোটেলে ইলিশের ঝোল আর গরম ভাতের স্বাদ ভোলা যাবে না। মনে আছে একবার স্টিমারে মুরগির ঝোল ভাত খেয়েছিলাম, অপূর্ব রান্না। ফোন নেই। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ১০ পয়সার পোস্টকার্ডে। প্রতি সোমবার মাকে চিঠি দিতাম। মা-ও পোস্টকার্ডে গোটা গোটা অক্ষরে উত্তর দিতেন। জলপাইগুড়িতে সবাইকে ছেড়ে প্রথম প্রথম কলকাতায় মনকষ্টে ভুগেছি। এখানে তখন বহু বন্ধুবান্ধব— ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা, আর অন্তহীন আড্ডা। ভাল লাগত না কলকাতা। চলে এসেছিলাম শহর ছেড়ে নদীয়া জেলার হরিণঘাটায়। মেসে থাকা। সেখানে এত স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি যে আজ ৪৫ বছর পর স্মৃতি দুর্বল হলেও যোগাযোগ সূত্র রয়ে গিয়েছে। আমি সর্বদা বলি উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর সর্বত্র মানিয়ে নিতে পারে। তাদের সরলতায়, ভালবাসায় জয় করে নিতে পারে নতুন পরিবেশ। আধুনিক তুখোর ব্যবস্থায় বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের যোগাযোগ থাকছে প্রতি মুহূর্তে। বাড়িতে যাতায়াতও এখন সহজ যখন-খুশি-তখন সম্ভব। সেদিনকার সঙ্গে আজকের উত্তরের শিক্ষা-পরিকাঠামোর আসমান জমিন ফারাক, অনেক উন্নয়ন ঘটে গেছে এর মধ্যে। তা সত্ত্বেও কমেনি শিক্ষা বা কেরিয়ারের জন্য বাইরে যাওয়ার ধূম, বরং আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। পড়াশোনা শেষ করে কজন দেশে ফিরে আসবার জন্য উন্মুখ হয় তাও বলা মুস্কিল। তবু সব ছাড়িয়ে যেটা আগের মতই রয়ে গিয়েছে, তা হল আজও আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে মিস করে নিজের পাড়া, খেলার মাঠ, বন্ধুদের আর বাবা-মাকে। যেটা আমাদের পরম তৃপ্তি দেয় নিঃসন্দেহে।

Adventure Sports first time ever at any eco-resort in Dooars

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP
Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Facilities: Tea Maker, Cold/Hot running water, attached toilet in every room;

Common Dine-in place for breakfast-lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall;

Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:
Kolkata 9903832123, 9830410808
Siliguri 9474904461, 9002722699

Mystic Murti mesmerises over Gorumara where luxury meets excitement

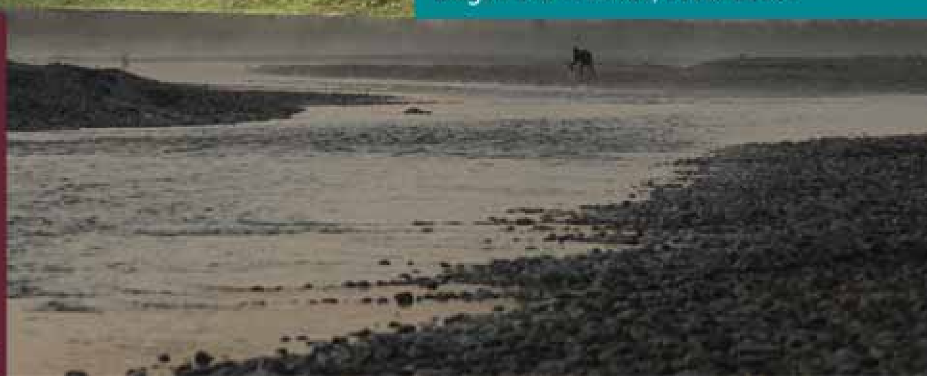

ইকো পর্যটনের রমরমা কি উত্তরের গ্রামীণ পাহাড়িদের বিকল্প পথ বাতলে দিতে পারছে?

ডামসাং ফোর্টের পথে

কলকাতার যেসব পর্যটন ব্যবসায়ীরা উত্তরবাংলার পাহাড়ে টুরিস্ট পাঠিয়ে টু-পাইস করেন, ২০১৭-র শেষ লগ্নে এসেও তাঁদের অনেকেই জানেন না, এই বছরটিকে পৃথিবী জুড়ে পালন করা হল 'সাসটেনেবল টুরিজম ইয়ার' হিসেবে। অর্থাৎ প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ও স্থানীয় জনজাতির মানুষকে অবিকল টিকিয়ে রেখে গড়ে তুলতে হবে পর্যটন স্পট বা সার্কিট। যাকে আমরা 'ইকো টুরিজম' বলে এতদিন জেনে এসেছি তা আদৌ প্রান্তিক মানুষগুলির কল্যাণে বা ইকোলজি সংরক্ষণে কাজে লাগছে কি? নাকি গ্রামীণ পর্যটন সম্পদকে একে একে চুষে নিংড়ে নেওয়ার অশুভ উদ্দেশে শহুরে ধান্দাবাজ শ্রেণির তৈরি মুখোশের শ্রুতিমধুর নাম 'ইকো টুরিজম'? হতেই পারে! কারণ কোনও প্রস্তুতি নেই, কোনও পরিকাঠামো নেই, কোনও সরকারি নীতি নেই, কোনও নজরদারি নেই, অথচ পাহাড় জুড়ে নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে ইকো পর্যটনের রমরমা শিল্প!! আমরা জানি পাহাড়-জঙ্গলের উত্তরবাংলায় সত্যিকারের ইকো টুরিজমের বিকাশ এখানকার যাবতীয় সমস্যা সমাধান ও উন্নয়নের পথ। তাই ঠিক কোন পথে চলেছে এখানকার খুচরো অবিন্যস্ত পর্যটন? তার মাঝে কেমন আছে এখানকার মানুষগুলি? এসবেরই সন্ধানে বেরিয়েছি আমরা।

রংরুট-এ লেখা আমার এক অভিজ্ঞতা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করে পোস্ট করেছিলাম ফেসবুক-এ। গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে সেই লেখাতে দুটি লাইন ছিল 'গ্রাম ভারতবর্ষই আমার ভারতবর্ষ। আমার দেশের সংস্কৃতি এবং সৌভাগ্যের শিকড় এই গ্রাম। আমার দেশে একটি চে গ্যেভারা থাকলে গ্রাম ও গ্রামীণ পর্যটন ভারতবর্ষকে বিলিয়ন ডলার এনে দিত।'

লাটাগুড়ির পাশাখায় ডুয়ার্স চায়ের মৌতাতে শুরু হল সকাল। গ্রাম ভারতবর্ষ দেখতে কোস্টারিকা থেকে এসেছে বন্ধু মারলেন ভাস্কয়েজ। ওর দিদি সত্তর সালে চে গ্যেভারার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এল সালভাদর-এর মুক্তিযুদ্ধে। মারলেনের তখন বাচ্চা বয়স। শুধু মনে আছে গেরিলা আর্মির পোশাকে দিদি আর দিদির একটা কথা— 'গ্রামকে ভালবেসো। গোটা দেশ তোমায় ভালবাসবে'।

রুটি খেতে ভালবাসে মারলেন। দেশি মুরগির কষা দিয়ে রুটি খেয়ে গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের ভিতর দিয়ে তিলাবারি-মঙ্গলবারি-গরুবাথান-লাভা হয়ে পৌঁছে গেলাম কালিম্পং-এর কোলাখাম। আগে থেকেই কথা ছিল আমরা কোনও রিসর্টে থাকব না। কৃষ্ণা এবং বিনয় রাইয়ের বাড়িতে আজ আমরা অতিথি। মে মাস তখন। পৌঁছলাম যখন তখন দুপুরবেলার রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে পাহাড়ে। মেঘের রাজ্যে বুকের বোতামখোলা রোদ্দুর। কৃষ্ণার দুই ছেলেমেয়ে ফিরে এসেছে স্কুল থেকে। মারলেনকে পেয়ে ওরা খুব খুশি। এই প্রথম কেউ ওদের বহুজাতিক সংস্থার চকলেটের বদলে দুটি কাঠের কচ্ছপ দিয়েছে। কোস্টারিকার গ্রামীণ শিল্পীদের হাতে তৈরি।

রাই দম্পতি

কৃষ্ণারা কি পারবে না এমন হাতের কাজ করতে? কাঠ দিয়ে পারবে না ওরা ছোট ছোট রেড পান্ডা বানাতে? আলবাত পারবে। কিন্তু কেউ যে কখনও ওদের বলেনি। আর বানালে কীভাবে বিক্রি করবে সেটাও জানে না। সারাবছর কোলাখামে দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক আসেন। অথচ কোলাখামের প্রাচীন শিল্প সংরক্ষণের কোনও কেন্দ্র নেই। কালিম্পং জেলা ঘোষণার আগেও ছিল না, এখনও নেই। এ যেন মুখ গুজে চুপচাপ বসে থেকে অপেক্ষা করা কখন দুষ্টু এনজিও-রা এসে গ্রামের শিল্পীদের রক্ত চুযে বাংলানাট্য করবে।

কৃষ্ণার হাতে মন ভাল করা তুলসী আর লেবু ঘাসের চা খেয়ে ঘরে ঢুকে পরলাম। একটু বাদেই আসছে সবজি পকোরা। বাইরে আকাশে জলভরা মেঘে তখন সূর্যাস্তের কলমালেবুর প্রতিফলন। আমরা ঘরের আলো জ্বালাই নি। মোমবাতি জ্বালিয়েছি। বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে বিরক্তিকর চাইনিজ সাদা আলো। যেটা পরিবেশ, পর্যটন এবং গ্রামীণ পর্যটনের সঙ্গে খুব বেমানান। যদিও কোলাখামে যথেষ্ট ব্যবহার এই উজ্জ্বল সাদা আলোর। সব চেয়ে বেশি আছে হেল্প টুরিজমের রিসর্টে। কোস্টারিকা, ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও গ্রামীণ পর্যটনে এই সস্তা সাদা উজ্জ্বল চিনা আলোর ব্যবহার নেই। এখানে এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। গ্রাম-গ্রামের মানুষ চুলোয় যাক। গ্রামীণ পর্যটন নিয়ে লজ্জায় মাথা নত হোক আমাদের, বিদেশি বন্ধুদের কাছে। আমরা হাত চুলকে তেল দেব

সকালে প্রাতঃরাশ সেরে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পরলাম। যাব দশ কিমি নিচে চাঙ্গে জলপ্রপাত। যাওয়ার পথটি বড় সুন্দর কিন্তু নিশ্চিন্তে হাঁটার উপায় নেই। সমানে গাড়ি নেমে আসছে ওপর থেকে।

সরকারি আমলাদের। কালিম্পং-এর বিভিন্ন মাপের নেতাদের দার্শনিক লেকচার শুনব আর কলকাতায় এসে পর্যটন নিয়ে সরকারি অনুষ্ঠানে বিনে পয়সায় হুইস্কি প্যাঁদাবো। কিন্তু কখনও উৎসাহ দেখাব না কালিম্পং-এর গ্রামীণ পর্যটনে প্রচলন হোক কমলালেবু বা নাসপাতির বিয়ার। দক্ষিণ সিকিমে যদি হতে পারে কালিম্পং-এ হবে না কেন!

গরম গরম সবজি পকোরা চলে এসেছে। ড্যানির সুস্বাদু বিয়ার খুলে ফেলেছি। ঘরে মোমবাতির আলো। টিনের চালে মুষলধারে বৃষ্টি। শুভরাত্রি কোলাখাম।

সকালে প্রাতঃরাশ সেরে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পরলাম। যাব দশ কিমি নিচে চাঙ্গে জলপ্রপাত। যাওয়ার পথটি বড় সুন্দর কিন্তু নিশ্চিন্তে হাঁটার উপায় নেই। সমানে গাড়ি নেমে আসছে ওপর থেকে এবং ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভরপুর ডিজেল। এলাকার পরিবেশ পর্যটনের সম্মানীয় পিতৃপুরুষ হেল্প টুরিজমের গাড়িও হুশস্ করে চলে গেল। জলপ্রপাতের দু' কিমি আগে রাস্তার ধারে ভাঙা মদের বোতল আর প্লাস্টিক প্যাকেটে ভর্তি। দূরে জলপ্রপাতের সামনে জোরে বক্স বাজিয়ে কিছু লোক খালি গায়ে নাচছে। লাভা থেকে এসেছে পিকনিক করতে। মারলেন এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে পরেছে। তারপর হা হা করে হেসে উঠে বলল, 'ইন্তেরিসান্ত' মানে ইন্টেরেস্টিং। 'জয় এবার আমি বুঝতে পেরেছি তোমার দেশের গ্রামে কেন তুমি চে গ্যাভারার অভাব বোধ কর। চলো শুরু করে দিই কাজ'। —আমি আর মারলেন মদের ভাঙা বোতল আর প্লাস্টিক এক জায়গায় করতে লাগলাম। একটি মানুষও গাড়ি থেকে নামেনি। এগিয়ে এলেন পঁয়ষট্টি বছরের বিমলা দেবী। পিঠে ছাগলের জন্য পাতা নিয়ে যাওয়ার বিরাট ঝুরি। আনন্দে মারলেন গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে বিমলা দিদিকে। মাথার স্কার্ফ খুলে দিদির গলায় পড়িয়ে দিয়ে মারলেন আনন্দে ডগমগ। 'জয়, বিমলা দিদি আমার দিদির মতো! দেশকে ভালবাসে।'

ফেরার পথে আমরা গ্রামের ভিতর দিয়ে ফিরেছি। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। হাসপাতাল মানে বত্রিশ কিমি দূরে কালিম্পং। অনেক সময় রুগি রাস্তাতেই মারা যায়। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় কোনওক্রমে ধুঁকছে। বিদেশি সহযোগিতায় আর একটি অবৈতনিক স্কুল ছিল কিন্তু এখন সব ভূতের বাসা। একটা গ্রামের মানুষ যদি কষ্টে থাকে, গ্রামের প্রতি যদি ভালবাসা না থাকে, সেই গ্রামে গ্রামীণ বা পরিবেশ পর্যটন হবে কী করে? *(এর পর আগামী সংখ্যায়)*

জয়ন্ত গুহ

ডুয়ার্সে হাতি আজ বিপন্ন! নাকি বিপর্যয়!

দিন কয়েক আগে লাটাগুড়ির জঙ্গলে বহু অসহায় দর্শকের সামনে হাতি আছড়ে মারল মানুষ। সেই মর্মান্তিক ছবি ভাইরাল হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। প্রশ্ন উঠল সেই লোকটি কি আদৌ প্রকৃতিস্থ ছিল? তবে হাতিটি ক্ষিপ্ত ছিল সন্দেহ নেই। যতক্ষণ প্রাণ ছিল, থেঁতলানো দেহটা একটু আধটু নড়াচড়া করছিল, হাতিটি কিন্তু ছাড়ে নি, ক্রমাগত আঘাত করেছে! মানুষ বনাম বন্যপ্রাণের সংঘাত যে আজ চরমে তা আর বলে দিতে হয় না! এতদিন অভিযোগের আঙুল ছিল মূলত রেল দফতরের দিকে। দ্রুত ধাবমান শকটের ধাক্কায় ক্রমাগত হস্তি নিধন ক্রমাগত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হতে অনেকাংশেই আজ আপাত সমাধান সূত্র বেরিয়েছে। বিকল্প রেলপথ ডাবল লাইনের জন্য বাজেট বরাদ্দ, তা না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা কমানো, মালগাড়ি চলাচল রদ, সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত ট্রেনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বন্যপ্রাণ প্রেমীরা। কিন্তু যে সমস্যাটি এতদিন ফোকাসে ছিল না সেটিই এখন প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডুয়ার্সে হাতির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, বনসংলগ্ন বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ত সংঘাত এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে যে তাকে অনতিবিলম্বে বিপর্যয় আখ্যা দেওয়াটা খুব একটা ভুল কিছু নয়। গুলি করে হাতি মেরে ফেলা নাকি হরমোন প্রয়োগে জন্মনিয়ন্ত্রণ—আদৌ কি সম্ভব এই অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মোকাবিলা? তিন বছর আগে প্রকাশিত নিবন্ধটি ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে!

কেনিয়ার মাসাইমারা-অ্যাবারডেয়ার- আম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্ক বেড়াতে গিয়ে ক'টা দিন শয়ে শয়ে আফ্রিকান হাতি দেখেছিলাম খুব কাছ থেকেই। কখনও গাড়ির জানলা থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট, কখনও তিনতলা বাড়ির ছাত থেকে নীচের উঠোনে। দলে দলে হাতির পাল নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করছে, জল বা খাবার খেতে ব্যস্ত, তার মধ্যেই কড়া নজর রাখছে আমরা কী করছি তার ওপর। একবার তো বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আম্বোসেলিতে একটা জায়গায় জলাভূমিতে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল একটা বড় দল । হঠাৎ দেখলাম দলপতি গোছের একটা মাকনা পাহাড়ের মতো সাইজের চেহারা নিয়ে বিশাল বিশাল কান দোলাতে দোলাতে আমাদের গাড়িটার দিকে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে আরও দুটি। আমরা শ্বাসরোধ করে বসে আছি, ক্যামেরার শাটার টেপাও বন্ধ কারণ টেলিলেন্সের গোটা ফ্রেম জুড়ে সেই পাহাড়। খুব কাছে আসতেই ভয়ে বোধহয় একবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম, ঈষৎ দুলুনি হতেই চোখ খুলে দেখলাম গাড়িটার গা সামান্য ছুঁয়ে সেই ঐরাবত আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল খানিক দূরের একটি জলাশয়ের দিকে। সাহস করে হাত বাড়ালেই তার গা-টা ছুঁতে পারতাম।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই রোমহর্ষক পরিস্থিতির কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় অবধারিতভাবেই উঠে এসেছিল একটি প্রশ্ন, আমাদের দেশের কোথাও, ধরা যাক ডুয়ার্সের জঙ্গলে, বেড়াতে গিয়ে এত কাছ থেকে নিশ্চিন্তে হাতি দেখা কি সম্ভব? তার ঝটিতি উত্তর হল, কল্পনাই করা যায় না। কিংবা না দেখা হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানকার বুনো হাতি মানুষ দেখলে এত দ্রুত উত্যক্ত হয়ে ওঠে যে তারা কখন কী ভাবে আচরণ করবে তা বলা মুশকিল। আমাদের দেশের ঐতিহ্য-পুরাণ-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা দেবতা হিসেবে পূজিত এই বিশালকায় প্রাণী আমাদের হাতেই যুগে যুগে এত লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত যে মানুষের সংস্পর্শে এসেই তারা অতি সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আজ বিশেষজ্ঞরা যখন বলছেন, এশিয়ায় বাঘের চাইতেও অনেক তাড়াতাড়ি অবলুপ্তির পথে চলে যাবে হাতি, তখন হাতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় রীতিমত বিপর্যয়ের সম্মুখীন ডুয়ার্স-তরাইয়ের জঙ্গল সংলগ্ন মানুষ। কপালে কুঞ্চন বনদফতরের অভিজ্ঞ কর্তাদের। মিটিং-ওয়ার্কশপ-অ্যাকশন প্ল্যান কোনও কিছুতেই সমাধান মিলছে না, বরং সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে।

আরও অনেকের মতোই হাতিই আমার প্রিয়তম বন্যপ্রাণ, যদিও আরও অনেকের মতোই জ্ঞান হওয়ার পর হাতির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সার্কাসের তাঁবু কিংবা রাজেশ খান্নার 'হাতি মেরে সাথি'-তে নয়। জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর ডুয়ার্স চত্বরে বেড়ে ওঠার সুবাদে পথেঘাটে যেমন যখনতখন দেখা পেয়েছি তাদের, তেমনই লোকালয়ে ঢুকে তাদের লণ্ডভণ্ড করার নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য অতি পরিচিত সেই ছোটবেলা থেকেই। একটু বড় হতেই জেনেছি হাতি মূলত যাযাবর শ্রেণির, একটি বিশেষ রুটে তারা সদলবলে বছরভর চক্কর কাটে বছরের পর বছর একইভাবে। সভ্যতা যতই হাত বাড়ায় জঙ্গলের সীমানায়, তাদের চিরকালীন চলার পথ আটকে মানুষ বাড়িঘর বানায়, ফসল ফলায়। ফলে অবধারিতভাবে শুরু হয় সংঘাত। ছোট্ট থেকে যে শিশু হাতিটি খিদে মেটাতে বড়দের সঙ্গে ফসল খেতে নেমেই মানুষের তাড়া খেয়ে পালাতে অভ্যস্ত, খিদে পেটে দিনভর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে খাবারের খোঁজে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হাঁটতে বড় হয়েছে তার স্মৃতিতে মানুষ সম্পর্কে বিদ্বেষ ছাড়া আর কীই বা জমতে পারে!

ছবি বিশ্বপ্রিয় রাহুত

ডুয়ার্সের মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকের সামগ্রিক চিত্রটি?

পুবে সংকোশ নদী পেরোলেই আসাম, সেখানে চোরাশিকারিদের আক্রমণ আর পশ্চিমে মেচি নদী পেরোলেই নেপাল, সেখানে ফসল পাহারাদারদের নির্বিবাদে গুলি। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় বলতে বক্সা, জলদাপাড়া, গরুমারা, চাপড়ামারি ও মহানন্দা অভয়ারণ্য, যেখানে খাবার ও পানীয় জল মোটামুটি মিলে যায়। বিপদটা হল সেখানেই। এর ফলে একই জায়গায় বাড়তে শুরু করল হাতির জন্ম-উৎপাদন। দশ বছরে যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ। সেই অনুপাতে জঙ্গল বেড়েছে ১.৭ শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। খাদ্যাভাবে লোকালয়ে ফসলের লোভে ঢুকে পড়ছে হস্তি বাহিনী, খেয়ে-মাড়িয়ে তছনছ করছে, বাড়িঘর ভাঙছে, জখম বা নিহত হচ্ছে মানুষ ও গবাদি পশু। 'মহাকাল' দেবতা হিসেবে পূজিত ঐরাবতের দল স্থানীয় দরিদ্র মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। মানুষ-হাতির অস্তিত্বের সংঘাত আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে। রাতের পর রাত মশাল জ্বালিয়ে খেত পাহারা দিয়ে পটকা ফাটিয়ে ক্লান্ত জঙ্গল সংলগ্ন দরিদ্র মানুষ। প্রখর বুদ্ধিমান হাতির দল সে সবকেও ফাঁকি দিতে শিখে গেছে। সংঘাতের মাত্রা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে, অস্তিত্বের তাগিদে একে অপরকে মরীয়া হয়ে আক্রমণ করছে। ধৈর্যের বাধ ছাড়িয়ে যেতেই, ফসল খেতে খোলা বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে রাখছে জেল-জরিমানার ভয়কে অগ্রাহ্য করে। তড়িতাহত হয়ে হাতি মৃত্যুর খবর আজ প্রায় নিয়মিত ও অতি পরিচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে বিশেষজ্ঞরা যেমন বলছেন সংঘাত এরকম চললে ডুয়ার্সে তথা উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় অনিবার্য তেমনই হাতির সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে বন দফতরের গর্বিত হওয়ার কথা তারাই আজ চূড়ান্ত অসহায় বোধ করছেন। আজ বনদফতরের সামনে চ্যালেঞ্জ একাধিক।

এক, খেত ফসল ঘরবাড়ি ধ্বংস করার ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে বহু টাকা বন দফতরের আয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার পরিমাণ বাড়ছে বই কমছে না।

দুই, বনদফতরের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তুলনায় কম মনে হওয়ায় অসন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা বেআইনি হাতি নিধনে লিপ্ত হচ্ছে, ফলে সংরক্ষণ বিরোধী কার্যকলাপ ক্রমশই ইন্ধন পাচ্ছে যা সমগ্র বিশ্বের চোখে চরম নিন্দনীয়।

তিন, গ্রামবাসীদের অসন্তুষ্টি-ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে চোরাশিকারিরা যে ফের ঘাঁটি গাড়ার সুযোগ পাচ্ছে তা দৃশ্যতই স্পষ্ট।

চার, হাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বনাঞ্চলের পরিমাণ সমানুপাতে বাড়ানো ভীষণ জরুরি, কারণ হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি কোনওভাবে রোধ করা সংরক্ষণ পরিপন্থী।

পাঁচ, হাতিদের চলাফেরার উপর সর্বক্ষণের নজরদারি, যার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

ছয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত চেতনাবোধ বাড়ানোর ব্যবস্থা এবং তার জন্য মিডিয়া ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে কাজে লাগানোর সদর্থক প্রয়াসে গড়িমসি।

সাত, প্রশাসন, বিদ্যুৎ, পর্যটন, দমকল ইত্যাদি সরকারি অন্যান্য দফতরের সঙ্গে সর্বক্ষণের সমন্বয় রাখা ভীষণ জরুরি। যাতে যে কোনও আপৎকালীন অবস্থায় দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা যায়।

আট, বিভিন্ন দফতরকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে হতে পারে অ্যাকশন প্ল্যান যার রূপরেখা আজ পর্যন্ত ভেবে বের করা যায়নি।

বিপর্যয়ের মোকাবিলা সম্ভব?

বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে যেটা সবচাইতে জরুরি সেটিকে খুঁজে বের করতে হবে। বিশেষজ্ঞ না হয়েও এটুকু বোঝা যায় যে বনাঞ্চলের পরিমাণ বাড়ানো রাতারাতি সম্ভব না হলেও জঙ্গলের ভেতর ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করে সেখানে হাতিদের পছন্দের খাদ্য বিশেষ প্রজাতির ঘাস লাগানো যেতে পারে যা দ্রুত করা সম্ভব। গুলি বা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে যদি সংকোশ বা মেচি নদী পেরিয়ে অসম বা নেপালের জঙ্গলে প্রবেশে হাতিদের অনীহা দেখা যায় তো সেই সমস্যাকে কী করে দ্রুত বিশ্লেষণ ও তার সমাধান করা যায় তা দেখা যেতে পারে। ডুয়ার্সের আদি জনজাতির মানুষেরা কিন্তু হাতি নিধনের পরিপন্থী। একটু ভালো করে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে যেখানে ফসল খেতে তড়িতাহত হয়ে হাতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে সেখানে হয় উদ্বাস্তু জনজাতির বসবাস নতুবা বেআইনি বা খাস জমিতে চলছে ফসল চাষ। প্রশাসনের সহযোগিতায় বন দফতর দৃষ্টান্তমূলক দু-চারটে শাস্তি দিলেই এই ধরনের নির্মম ঘটনা অনেক কমে যাবে।

সভ্যতার বিস্তারকে যেমন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তেমনই অরণ্যভূমিকেও কমানো যাবে না। পাশাপাশি সহাবস্থানে ঠোকাঠুকি লাগবেই। কিন্তু এটাও ঠিক শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও হাতিবাহিনী যে বারংবার লোকালয়ে বা ফসল খেতে ফিরে আসে তা কখনই শখ করে নয়। তাদেরকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পথ দেখালেই তারা চলে যাবে। কারণ একটা কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান নেহৎ বাধ্য হয়েই, তাদের কাছে তা কখনই কাম্য নয়।

আর একটি বাস্তব সত্য সবাই মেনে নেবেন, আশা করছি বন দফতরের কর্তারাও। হাতিদের চেহারার মতোই এই বিশাল দায়িত্ব পালন করা বনদফতরের একার নয়। এর জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে বিশেষজ্ঞদের, ভুক্তভোগী মানুষের প্রতিনিধিকে, সংরক্ষণবাদী সংগঠনগুলিকে, কবে প্লেনের টিকিট ও নিমন্ত্রণ আসবে তার অপেক্ষা না করেই। দফায় দফায় আলোচনা হোক, প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাব চলুক, প্রয়োজনে ভিডিও কনফারেন্সিং করে জেনে নেওয়া যেতে পারে দূরের ভিনদেশীদের অভিমত। অ্যাকশন প্ল্যান তার মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসতে বাধ্য। প্রথমবারের জন্য আহ্বায়ক অবশ্য হতে হবে সেই বন দফতরকেই।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

পর্যটনের ডুয়ার্স

রূপসী রংটং

মন উদাস থাকলে কখনও চলে যাই কাছে পিঠে কোনও এক নির্জন নিরিবিলি জায়গায়। যেখানে গেলেই মুহূর্তেই মনের বিষণ্ণতা বিলীন হয়ে যায়। অনুভূতিতে জাগে আনন্দের উচ্ছ্বাস। বাড়ি আমার জলপাইগুড়ি। উত্তরবঙ্গের মানুষ বলে গর্ববোধ করি। কারণ শুধু একটাই! পাহাড়-জঙ্গল-নদী-চা বাগানের সমাহারে সজ্জিত, আমাদের অপরূপ উত্তরবঙ্গ। তাই যখনই মন চায়, টুক করে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে পারি। কণ্ঠে তখন একটাই গানের কলি জাগরিত হয়, ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা... মনে মনে!’ তবে মনে মনে কল্পভাবনায় না হারিয়ে বাস্তবের অপার সৌন্দর্যে মধ্যেই পাড়ি দিই বাঁধন হারার আনন্দে। আমার শহর জলপাইগুড়ি থেকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রতিবেশী শহর শিলিগুড়ি। উত্তরের কর্মব্যস্ত শহর এই শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেনের রাস্তা ধরে সোজা পাহাড়ে উঠলেই হিলস্টেশন হিসেবে প্রথম রেলওয়ে স্টেশন রংটং। শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সপরিবারে নিজস্ব পারিবারিক গাড়ি ছুটিয়ে রওনা দিলাম গন্তব্য রংটংয়ের দিকে।

কিছুটা এগিয়ে গেলেই শিলিগুড়ির কোলাহল থেকে মুক্তি। শুরু হয়ে যায় পথের দু’পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ চা-বাগিচা এবং বনাঞ্চল। সামনে নীলাভ পাহাড়ের হাতছানি। প্রকৃতির অপরূপ সজ্জা দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া সুকনাতে। সুকনা মোড় থেকে দুটি রাস্তার ভাগ। পশ্চিম দিকে চলে যায় দুধিয়া অভিমুখে। আর উত্তর দিকে টয়ট্রেনের ন্যারোগেজ লাইনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা দার্জিলিঙের দিকে এগিয়ে যাওয়া। সুকনার প্রাকৃতিকগত সৌন্দর্যেরও কোনও তুলনা হয় না। শিলিগুড়ি থেকে সুকনা পর্যন্ত সিটি অটো এবং সিটি বাস পরিষেবা পাওয়া যায়। সুকনা বাজারে হালকা টিফিন করে নেওয়াই যায়। সুকনা রেলস্টেশনের সামনে প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতার হনুমান দেবের মূর্তি সত্যিই নজর কাড়ে। এই সুকনা থেকেই শুরু দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল। পাহাড় ও সমতলের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে সুকনা। সুকনার লোকালয় ছাড়ালেই শুরু পাহাড়ি পথ। দু’ধারে সুউচ্চ বৃক্ষরাজির ছায়া পাহাড়ি পথকে মায়াবী করে রাখে। শুনসান এই পথে হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির দেখা মেলে। কোনও কোনও সময় পাশ দিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যায় ছবির ক্যানভাস থেকে উঠে আসা খেলনা রেলগাড়ি। এমনই ভাবে প্রকৃতির বিশুদ্ধ হাওয়ায় শ্বাস নিতে নিতে দু’ নয়নে সবুজের পরশ মেখে পাহাড়ি পথে বাঁক নিতে নিতে পৌঁছে যাওয়া প্রথম পাহাড়ি ছোট্ট জনপদ রংটংয়ে।

রংটংয়ের নামের মধ্যেই সাহেবিয়ানার ছোঁয়া। হাতে গোনা কয়েকটি বাড়িঘর পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ে ওঠার পর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথে রংটংই প্রথম পাহাড়ি রেলওয়ে স্টেশন। নির্জন নিরিবিলি রংটং স্টেশন ঠিক যেন পোস্টকার্ড সাইজের এক টুকরো ছবি। একফালি ছোট্ট এই স্টেশনটি বিভিন্ন গাছগাছালিতে সজ্জিত। উদ্যানে থাকা চেয়ারগুলি এখানে শোভা বাড়িয়ে তুলেছে অনেকখানি।

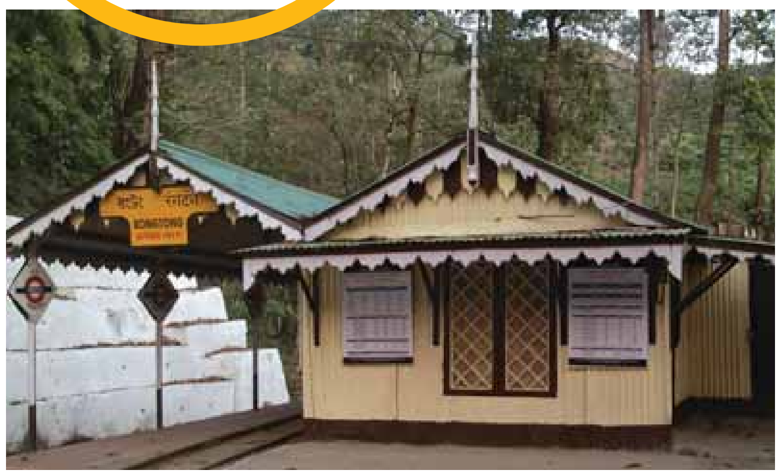

স্টেশনে চিরপরিচিত কোলাহলের বিন্দুমাত্র কোনও লেশ নেই। স্টেশনকে ঘিরেই রংটংবাসীর বাড়িঘর। কয়েকটি মাত্র ছোট ছোট দোকান ও হোটেল। স্টেশনের চেয়ারে বসেই সময় যে কীভাবে কেটে যাবে, তা বোঝাই সম্ভব নয়। এক আলাদা আকর্ষণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে সময়ের কাঁটা। একদিকে সুউচ্চ পাহাড়, আরেক দিকে গভীর গিরিখাদ। প্রকৃতির অকৃপণ দান হয়ত একেই বলে! শিলিগুড়িতে কখনও কোনও কাজে এলে অল্প সময়ের অল্প দূরত্বের এই রংটংয়ে কিছুটা মুহূর্ত কাটিয়ে যেতে পারেন আপনিও।

শুভ্রজিৎ পোদ্দার

ধারাবাহিক কাহিনি

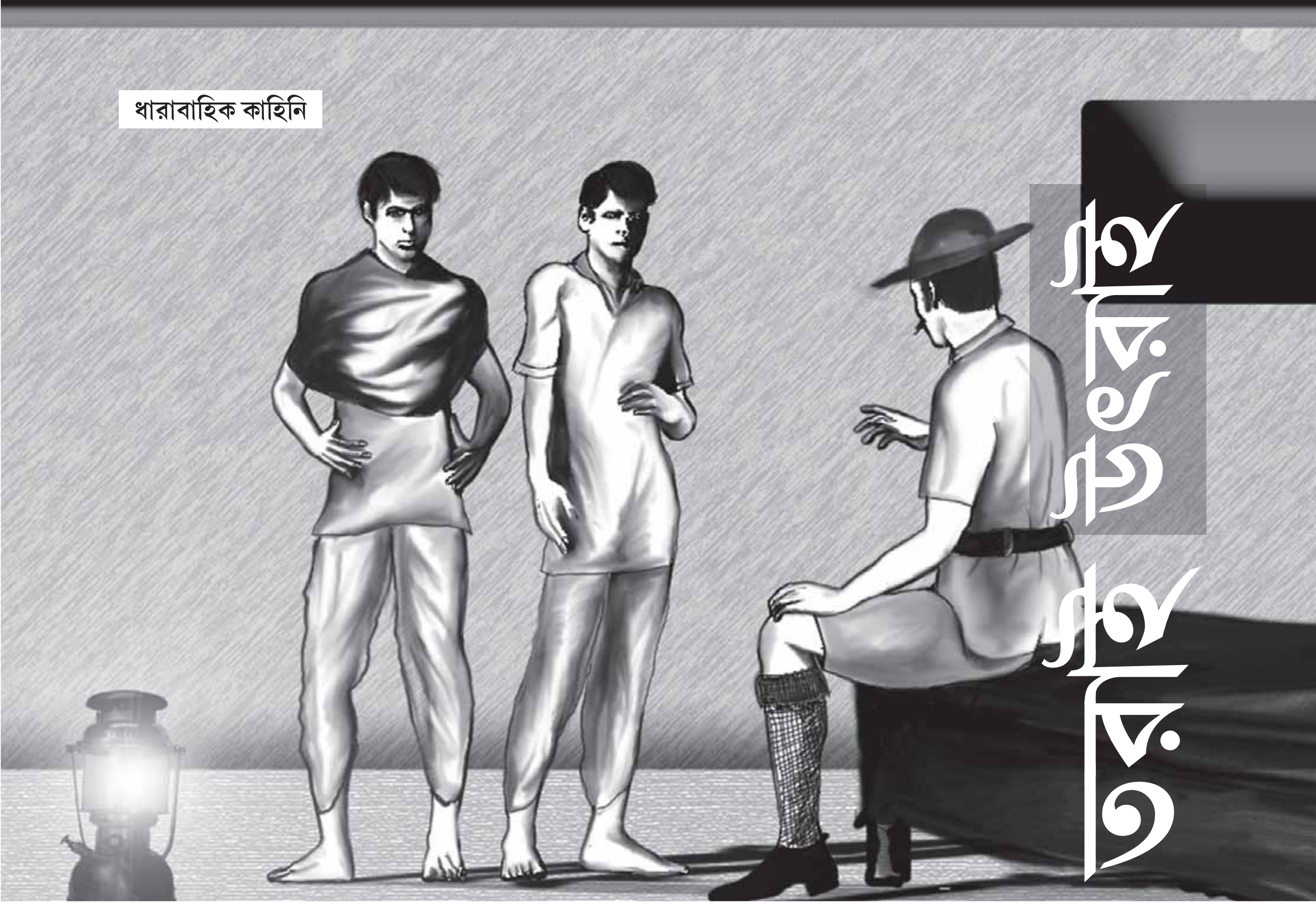

৫৮

দোমোহানির ঘাটে মাঝিরা জোর উৎসাহে মাছের ঝোল আর ভাত রান্নায় ব্যস্ত। তিস্তার হাওয়ায় শরীরের কাঁপুনি ধরে যাচ্ছিল বলে বীরেন আর গগনেন্দ্র নৌকোর ঘরে তক্তপোষের ওপর গায়ে চাদর জড়িয়ে বসে গল্প করছিল। তারিনী বসুনিয়াও ছিলেন নৌকোতে। তবে ঘরের বাইরে। তাঁকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছিল না যে নদী হাওয়াটা আদৌ ঠান্ডা।

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখল বীরেন। চাঁদ উঠতে এখনও কম করে আধ ঘন্টা। উপেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য জঙ্গলের গভীরে ঢুকতে হলে কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার -— তা নিয়েই গল্প করছিল দু-জনে। বৃষ্টির কারণে বনপথের অবস্থা অনুকূলে থাকবে না বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। দু-জনের শরীরে শিকারের পোষাক ছাড়াও পায়ে হান্টিং জুতো রয়েছে। দু-জনেই তাই আশাবাদী যে খুব একটা সমস্যা হবে না। কিন্তু মাছ-ভাতের আয়োজন করার জন্য মাঝিরা নৌকো থেকে নেমে যাওয়ার পর তারিনী বসুনিয়া তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন যে উপেনের সঙ্গে দেখা করতে তিনি যাবেন না। তিনি নৌকোতেই থাকবেন। তিনি ঝোলায় করে যে অস্ত্রগুলো এনেছেন সেটা উপেনের হাতে তুলে দিতে হবে তাঁদেরকেই।

সে বিষয়ে বীরেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। থেমে গেল একটা চলমান আলোকে জানালার বাইরে দেখে। অচিরেই বোঝা গেল একটা নৌকো প্রায় নিঃশব্দে তাঁদের নৌকোর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। সে নৌকোর সামনে জ্বলছে একটা বড়ো লণ্ঠন।

'আছেন নাকি কেউ বোটে?'

বাজখাঁই হাঁকটা শুনেই বীরেন একটু অবাক হয়ে বলল, 'কে?'

তারপর বেরিয়ে এসে আরেকটু অবাক হয়ে দেখল দারোগা বিনয় মুস্তাফি ইউনিয়ন জ্যাক লাগান পুলিশের নৌকো নিয়ে হাজির হয়েছেন।

'টহল মারতে মারতে আপনাদের বোটটা দেখলাম। লোকজন সব গেল কোথায়?' মুস্তাফি এদিক ওদিক তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন।

'রাতের খাওয়া সারছে। ঘাটে নামলেই দেখতে পাবেন।'

'আরে দেখার কী আছে!' মুস্তাফি হাসলেন। 'ঘটনাটা হলো যে লালবাজার থেকে তার এসেছে বিকেলে। এট লিস্ট দু-জন বিপ্লবী আজকালের মধ্যেই এদিকে আসছে। বুঝতেই পারছেন! সারা রাত টহল মারতে হবে। তা আপনার শিকারে যাবেন কখন?'

কথাবার্তা শুনে গগনেন্দ্রও বেরিয়ে এসেছিল। মুস্তাফির প্রশ্নে সে আড়চোখে তাকাল বীরেনের দিকে। বীরেন অবশ্য জবাব না দিয়ে একটু হেসে বলল, 'আসল কথাটা জোরে বলতে পারব না। এদিকে এলে একটু চা খেতে খেতে শুনতেন না হয়!'

'চা? আছে নাকি?' মুস্তাফি খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। হাঁক দিয়ে বললেন, 'এই! তক্তা ফেল জলদি!'

কাঠের একখানা তক্তা দুই নৌকোর মাঝে ফেলে দেওয়া হলো। সেই সেতু দিয়ে বজরায় পা দিয়ে বিনয় মুস্তাফি প্রশংসার সুরে বললেন, 'আয়োজন তো ভালোই মনে হচ্ছে। গোপালবাবু খরচা করেছেন দেখছি।'

'ভেতরে আসুন।'

বিনয় মুস্তাফি কাঠের ঘরটায় ঢুকে আরো কয়েক মাত্রা প্রশংসা গলার সুরে ফুটিয়ে বললেন, 'ব্যাটারিও এনেছেন দেখছি। শিকারে যাচ্ছেন না পিকনিকে যাচ্ছেন বোঝাই যাচ্ছে না।'

'শিকার কি শুধু বাঘ-হাতিই হয়?' বিনয় রহস্যময় হাসি হেসে বলে। 'দেখছেন না দুটো জোয়ান ছেলে ঘাটে বজরা নিয়ে একা

অপেক্ষা করছে। শিকার এসে পালঙ্কে উঠবে দারোগাবাবু!'

বিনয় মুস্তাফি দু-সেকেন্ড পর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে বললেন, 'তাই বলুন মশাই! অ্যাঁ! শিকার পালঙ্কে আসবে! এ তো আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল! দু-দু-জন জোয়ান মদ্দ রাতের বেলা শিকারে যাচ্ছে— এটা তো দিনের আলোর মত পরিষ্কার! আসলে ওই বিপ্লবীদের ইনফর্মেশনটাই সব গুলিয়ে দিয়েছে, বুঝলেন?'

বীরেন ফ্লাস্ক থেকে সুগন্ধি চা পেয়ালায় ভরে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'কেক খাবেন তো? শুকনো খাবার অনেক এনেছি আমরা।'

'দিন দিন!' মুস্তাফি তক্তপোষে আয়েস করে বসলেন। 'বজরায় বসে চা-কেক খাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবি নি কোনও দিন। তা, আপনাদের শিকার কখন ফাঁদে পড়বে বীরেনবাবু? হাতে সময় আছে তো?'

'তাড়া নেই।'

হাফ ডজন কেক, গন্ডা কয়েক বিস্কুট আর দু-পেয়ালা চা উদরসাৎ করে হাসি মুখে তৃপ্ত বিনয় মুস্তাফি যখন পুলিশের নৌকোয় উঠে টাউনের দিকে রওনা দিলেন তখন চাঁদ উঠে গেছে। তাঁর নৌকো দূরে চলে যেতেই তারিনী বসুনিয়া নৌকোর প্রান্ত থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'মুস্তাফি দারোগা ঠিকই সন্দেহ করেছিল। আমরা শিকারে যাচ্ছি না। তবে যা শুনে গেলেন তাতে তাঁর মনে আর কোনও সন্দেহ নেই।'

গগনেন্দ্র হাসতে হাসতে বীরেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'সত্যি তোমার জবাব নেই। পালঙ্কে শিকার আসার কথাটা আজীবন মনে থাকবে।'

মাঝির দলের নৈশ ভোজন শেষ হয়েছে। এবার তাঁর হৈ হৈ করে ফিরে আসছে বজরায়। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের হলদে আলোয় চারপাশ খানিকটা স্পষ্ট হলেও কেমন জানি ভূতুড়ে হয়ে আছে। ঘাটের দোকান ঘর, হোটেলের আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে একে একে। আধঘণ্টা আগেও লোকজনের হৈ হল্লা শুনতে পারছিল বীরেনরা। এখন অনেকটাই শান্ত। খুব জরুরী দরকার ছাড়া রাতে নৌকো চলাচল প্রায় থাকেই না। কিছু মাছ ধরার ছোট নৌকো রাতের নদীতে ঘুরে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু জল একটু না কমলে ভাল মাছ পাওয়ার আশা কম বলে তারাও আজ জলে নামেনি তেমন। বজরা যখন দোমোহানির ঘাট থেকে উজানের পথ ধরল, তখন চারদিক নিশ্চুপ হয়ে এসেছে। কেবল একটানা কল-কল, ছল-ছল শব্দ। এবার তার সঙ্গে মিশল দাঁড় টানার ছপ ছপ আওয়াজ।

মাছভাত খেয়ে মাঝিরা জোর ফিরে পেয়েছে। দেখতে দেখতে দোমোহানি ঘাটের শেষ দু-চারটে আলো মিলিয়ে গেল। পূব পাড় ঘেঁসেই এগিয়ে যাচ্ছিল বজরা। পাড় খুব বেশি হলে পঁচিশ তিরিশ হাত দূরে। বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে তারিনী বসুনিয়া তীব্র চোখে পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন কোনও আলোক সঙ্কেত নজরে পড়ে কি না। পূবের জঙ্গল থেকে একটা নদী বেরিয়ে এসে তিস্তায় যেখানে মিশেছে, সেটা আর দূরে নেই। বীরেন আর গগন সামনের দিকে তাকিয়ে থেকে মিলনস্থলটা বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সামনে নদীর ওপর জমে থাকা কুয়াশা ছাড়া আর কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

তখনই পাড়ের একটা অংশে একটা মশাল জ্বলতে দেখা গেল। কম্পমান আলোর শিখা দুলতে শুরু করল ডাইনে বাঁয়ে। সেদিকে তাকিয়ে তারিনী বসুনিয়া মাঝিদের হুকুম দিলেন বোটটাকে পাড়ের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে। কাজটা অবশ্য সহজ নয়। জলের গভীরতা আন্দাজ করে বজরা পাড়ের দিকে নিতে হবে। অভিজ্ঞ মাঝিরা লগি দিয়ে জল মাপতে মাপতে বজরার মুখ ডান দিকে ঘোরাল। একটু পরে স্পষ্ট বোঝা গেল একজন পাড়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত মশাল নাড়াচ্ছে।

'আর হবে না বাবু!'

মাঝিদের গলা শুনল গগন। পাড় তখনও হাত দশেক দূরে। মশাল বাহক এবার মশালটা নিভিয়ে নেমে পড়ল জলে। তারপর ছপ ছপ করে সাঁতার কেটে ভেসে এলো বোটের গায়ে। তারিনী বসুনিয়া ততক্ষণে ছাদ থেকে নেমে এসেছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে লোকটিকে বোটে উঠতে সাহায্য করলেন।

'শিকার ওদিকে।' মাঝিদের দেওয়া গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বলল লোকটি। 'ওই কুয়াশাটা যেখান থেকে শুরু, সেখানেই নদীটা তিস্তায় মিশেছে। বজরা সে নদীতে ঢুকিয়ে দিন। আমরা উত্তর পাড়ে নামব।'

বীরেনরা ছাদ থেকে নামে নি। লোকটি জামা ধুতি বদলে একটু লুঙ্গি পরে গায়ে চাদর জড়িয়ে ছাদে উঠে এলো। এবার তাঁকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল ওরা। একজন দেশিয় মানুষ। উচ্চতা বেশি নয়। বয়স তিরিশের কম বলেই মনে হলো। বীরেনদের দেখিয়ে তারিনী বসুনিয়া তাঁকে বললেন, 'এরা দু-জন যাবেন দেখা করতে। আমি নৌকোয় থাকব। উপেন কি একা এসেছে?'

'কলকাতার ওদিক থেকে দু-জন বিপ্লবী পালিয়ে এসেছেন আজ। দেখা সাক্ষাতের পালা মিটলে উপেনদা ওদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে।' মৃদু স্বরে জানাল লোকটি। তারপর বীরেন-গগনকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমার নাম নিরাপদ বর্মন।'

'দেখা হয়ে ভাল লাগল।' বলল বীরেন। 'কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা বিপ্লবীদের নিয়ে উপেনবাবু ঠিক কী করতে চাইছেন?'

'আপনাদের বলা যায়।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নিরাপদ বর্মন বললেন। 'তারিনীদা কিছু আর্মস এনেছেন। আরও যোগার হচ্ছে। আমরা ডিনামাইট স্টিক খুঁজছি। রেল লাইন উড়িয়ে দেব। তারপর বক্সা জেল আক্রমণ করব।'

মরা চাঁদের ক্লান্ত, পীত আলোর নিচে বিস্তির্ণ তিস্তার বুকে জমে থাকা কুয়াশার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল বজরা। সেই কুয়াশা এসে জড়িয়ে যাচ্ছিল ওদের প্রত্যেকের শরীরে। বীরেন আর গগন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে ছিল নিরাপদ বর্মনের মুখের দিকে। তল থেকে পেট্রোম্যাক্সের আলো এসে পড়েছে তাঁর মুখে। সে মুখ কঠিন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরল।

ডুয়ার্সের গভীর শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে কয়েকটি তরুণ গুটি কয় অস্ত্র নিয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে বক্সা জেল থেকে বন্দিদের ছিনিয়ে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখছে। নিরাপদ বর্মন সে অসম্ভব, অসম যুদ্ধের একজন শরীক। সে জানে যে এ যুদ্ধ অসম্ভব। উপেনও জানে এ যুদ্ধ একপেশে। কিন্তু ওদের কাছে যুদ্ধটাই জীবন। ফলটা নয়। ওদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে মৃত্যুর টেলিগ্রাম এসেছে। ওরাই পাঠিয়েছে সে টেলিগ্রাম নিজের ঠিকানায়। ওরা মরবেই।

হঠাৎ করে জল চলে এল গগনেন্দ্রর চোখে। ঝাপসা হয়ে গেল সব কিছু। মুছে গেল নদী-জল-পাড়-আকাশ-চাঁদ-মানুষ-দেশ। কার্তিকের বিষণ্ণ বিকেলে সেই নদী সঙ্গমে ধূ ধূ বালুচরে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম সামনে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে থাকা পর্বতশ্রেণী। মাথা উঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা। পেছনে পড়েছিল মরে যাওয়া দোমোহানি।

'অবশেষে উপেন।' ডুয়ার্সের হরিদ্রাভ আত্মা বললেন আমার দিকে চেয়ে। 'ওই দেখ। বজরা আবার ঘাটে লাগছে।'

আবার পিছিয়ে গেল কালচক্র। শুকনো তিস্তা পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল অসীমে। গম গম করে উঠল দোমোহানি। গাজলডোবার ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া তিস্তা আবার ফিরে পেল যৌবন। চোখের জল আড়ালে মুছে গগনেন্দ্র দেখতে পেল বজরা থামছে। সামনে চর। সেটা পাড় অব্দি ছড়িয়ে আছে। এ নদীতে জলের গভীরতা কম। বজরা তাই সঙ্গমের মুখে এসে নোঙর ফেলছে। মাঝিরা কাঠের পাটাতন লাগিয়ে দিচ্ছে চরে নামার জন্য।

'মাইলখানেক পথ হাঁটতে হবে এখান থেকে।'

নিরাপদ বর্মন বললেন।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ দেবরাজ কর

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন। প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা।**

বইমেলার মরশুমে আরও প্রকাশিত হচ্ছে

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?

গৌতম চক্রবর্তী

গত এক বছরে ডুয়ার্সের চা-শিল্পের পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সরেজমিনে বাগান ধরে ধরে ঘুরে দেখে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। অবনতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যেমন ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে চায়ের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশাল মাফিয়া চক্র, তারও ইঙ্গিত মিলেছে বহু জায়গায়। এই সংকলনে ধরা পড়েছে এক অবিশ্বাস্য যুগ। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এই বইটি সাড়া জাগাবে কোনও সন্দেহ নেই। **১৫০ টাকা**

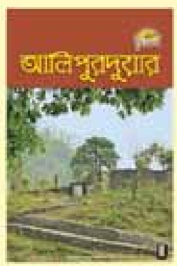

আলিপুরদুয়ার

সংকলন

রাজ্যের এই নবীন জেলাটি ইকো পর্যটন তথা অরণ্য সম্পদের একটি খনি বলা যায় নিঃসন্দেহে। কোনও প্রকৃতিপ্রেমী বা কোনও ইকো পর্যটকের জন্য এই জেলা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ভাষায় কোনও প্রামাণ্য গাইড বই বেরোয়নি। আলিপুরদুয়ারের প্রাচীন জনজাতি বা লোক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য কিন্তু বিশাল। সাধারণ পর্যটক যাঁরা আজ উৎসুক হয়ে আলিপুরদুয়ারে আসছেন, তাঁদের জন্য দু'মলাটে বন্দি তথ্য সমৃদ্ধ কোনও বই নেই। বিশিষ্ট লেখকদের বিষয়ভিত্তিক রচনা নিয়ে এই সংকলন এর আগে হয়নি। **২০০ টাকা**

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির চর্চার পটভূমি একদিন বদলে গেল। পরিস্থিতির চক্রে ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, তারপর রাজীব গান্ধীর বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলের হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কাটাবার অভিজ্ঞতা হল, পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়ার সুযোগও। দীর্ঘ ২৬ বছরের উত্তরবাংলা, কলকাতা হয়ে দিল্লি তথা গোটা দেশের রাজনীতির ছবি ধরা পরেছে জনপ্রিয় নেতার কলমে।

১৫০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

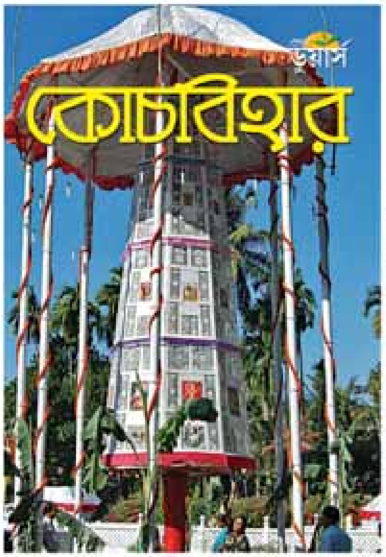

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

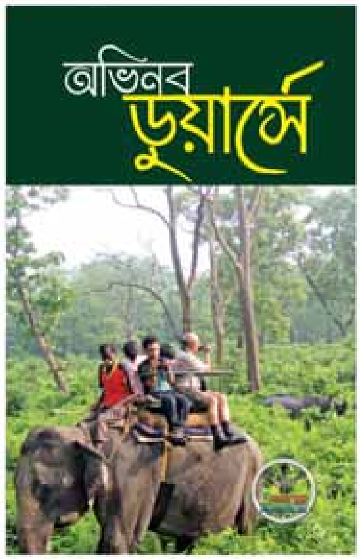

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

চা-শিল্পের বই

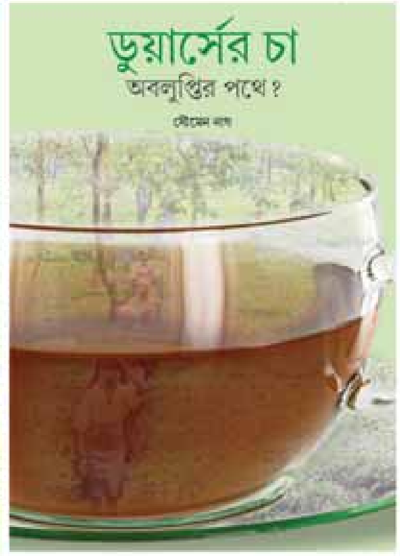

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

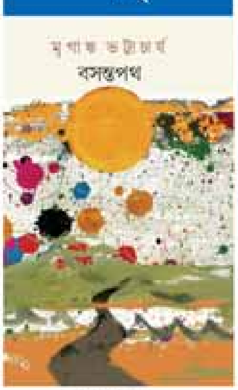

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

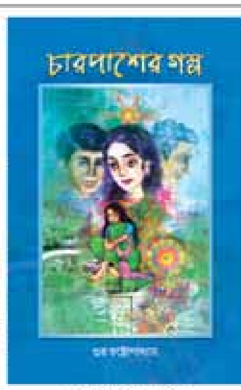

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

**আড্ডাঘর।
মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড,
জলপাইগুড়ি**

শিকড়ের টানে বল্লরীরা

ওদের যখন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তখন না ছিল ল্যান্ড ফোনের বহুল ব্যবহার, না ছিল মুঠোফোনের দাপট। স্কুল কলেজের গণ্ডী পেরোনোর পর ভরসা ছিল সেই নীল খাম নয়ত হলুদ পোস্টকার্ড। এরপর চাকরি বা বিবাহসূত্রে কে যে কোথায় ছড়িয়ে গিয়েছিল— সেই খবর ঠিকমতো কারোর কাছই ছিল না। তাও কোচবিহারে বাড়ি হওয়ার জন্য কোনও কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সংসার চাকরি সামলাতে সামলাতে কবে যে জীবনের অর্ধেকটা পার হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারেনি ওরা। ওরা মানে কোচবিহারের সুনীতি একাডেমীর কয়েকজন প্রাক্তনী। বহু বছর পর হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খুঁজে পেল তারা সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে। ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ আবার করে ফিরিয়ে দিল ওদের হারিয়ে যাওয়া শৈশব। কোচবিহার, কলকাতা, দুর্গাপুর, দিল্লি, বাহরিন আজ হোয়াটসঅ্যাপের এক গ্রুপে বন্দি। সংসারের দায়িত্ব কর্তব্যের ভার কিছুটা হালকা এখন। তাই দৈনন্দিন আড্ডার মধ্যেই একদিন উঠে এসেছিল এক সঙ্গে কিছু একটা করার ইচ্ছা। সেই থেকেই জন্ম বল্লরীর। গত ১৬ নভেম্বর খুব অনাড়ম্বর ভাবে তারা নিজেদের সাধ্য মতো ১২ জন দুঃস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাতে তুলে দিল কম্বল। এই শীতে যাতে একটু হলেও তাদের কষ্ট কম হয়। সামান্য খাবারের পাশাপাশি সেদিন কিছু টাকাও তাদের দিয়েছিল বল্লরীর সদস্যরা। স্থানীয় পাটাকুড়া ক্লাবের সদস্যরা ক্লাব ঘরে এই আয়োজনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বিনা শর্তে। তাদের সংস্থার প্রথম উদ্যোগ কোচবিহারেই কেন— এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লরীর পক্ষ থেকে সুমিতা মজুমদার জানালেন, সকলেই এখানে ছুটে এসেছে শিকড়ের টানে। অনেকেরই বাড়ি হয়ত আর কোচবিহারে নেই, কিন্তু শৈশবের সেই টান আজও একই থেকে গিয়েছে। তাই তো দোলনচাঁপা, স্মিতা, সুমিতা, শাশ্বতীরা প্রথমেই ছুটে এসেছিল এখানে, তাদের কৈশোর ভূমিতে। সঙ্গে পেয়েছিল কোচবিহারের রাখি ঝুমুরদের। আর যারা আসতে পারেনি নানা কারণে তারও মনে মনে কিন্তু সেই দিনটিতে ছিল এই কোচবিহারেই। তাদের এই উদ্যোগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ছড়িয়ে দিতে চায় বন্ধুরা যে যেখানে রয়েছে সেই সব জায়গায়। প্রথমে ১৬ জন শ্রীমতি মিলে পথা চলা শুরু করলেও এখন পরিচিত অনেকেই তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী হয়েছে। মাত্র তিন মাসেই সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩। আগামীতে বল্লরী নিশ্চয়ই মানুষের জন্য কিছু করার ভাবনাকে মূল মন্ত্র করে এগিয়ে যাবে আরও অনেক দূর।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

মুখরোচক ইভিনিং স্ন্যাক্স

বাঙালি মানেই উৎসব আর উৎসব মানেই ভূরিভোজ। সারা বছর যা-ই হোক না কেন, উৎসবের ক'দিন আমরা একটু অন্যরকম খেতেই পছন্দ করি। না, এই সময় কোনও ডায়েট চার্ট মানা যাবে না। সুগার-প্রেশার যা-ই থাক, নিয়ম মানব না। আজ আমি ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, স্ন্যাক্স, ডিনার— অর্থাৎ গোটা একটা দিনের খাবারের চারটে রেসিপি দিলাম। পছন্দ হলে যে কোনও একদিন পরিবারের সকলকে রেঁধে খাওয়ান। যাকে খাওয়াবেন, সে-ও খুশি হবে আর আপনিও তৃপ্তির হাসি হাসবেন।

উপকরণ:

ছোট আলু, পেঁয়াজকলি, বাধাকপি, ক্যাপসিকাম, কাঁচালঙ্কা, টমাটো, বিনস, ব্রোকোলি— সমস্ত সবজিই নিজেদের চাহিদা মতো। আধ চা-চামচ পাতিলেবুর রস, গোলমরিচ গুঁড়ো, অ্যারিগ্যানো বা অন্য কোনও হার্বস, লবণ, চিনি স্বাদ মতো, অলিভ অয়েল ২ চা-চামচ, পিউরি ২ চা-চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা-চামচ।

প্রণালী:

ছোট আলুগুলি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে শুকনো তাওয়ায় টমাটো পিউরি ও কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন যতক্ষণ না আলুর গায়ে মশলাটা ভাল করে লেগে শুকিয়ে যায়। তারপর কড়াই বা তাওয়াতে অলিভ অয়েল দিয়ে আলুসহ সব সবজি দিয়ে দিন ও ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। এক্ষেত্রে বিনস ও ব্রোকলি আগে থেকে একটু ভাপিয়ে নেবেন, সব সবজি মিলেমিশে গেলে কম আঁচে মিনিট দশেক রান্না করুন তারপর নামাবার আগে অ্যারিগানো, গোলমরিচ গুঁড়ো, লবণ, লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে নিন। গার্লিক ব্রাউন ব্রেড দিয়ে খান, সন্ধে বা সকালের জলখাবার দারুণ জমে যাবে। এটি একটি হেলদি ও মুখরোচক খাবার।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

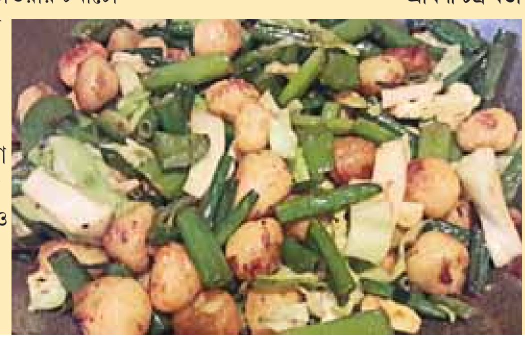

ফিরে দেখা

বালিকাবেলার যে ডুয়ার্স আমার চেনা

দেশ যখন স্বাধীন হল বা হওয়ার মুখে তখনকার কথা। তখন কেমন ছিল আমাদের ডুয়ার্স? তার এক খণ্ড চিত্র এখানে মিলতে পারে সে সময়ের এক কিশোরীর সত্তর বছরের পুরনো স্মৃতি হাতড়ে।

ফেলে আসা জীবনের কথা কেউ যদি লিখতে বলে তা কি নিখুঁত হবে? সেটা যদি হয় আবার জীবনের তিনভাগ পেরিয়ে এসে? বিস্মৃত ঘটনাসমূহ মনে করিয়ে দেবার মতো কেউ তো আর ইহজগতে নেই। পাহাড়ি জীবনযাত্রা তখন যেমন দেখেছি, এখন তো মিলে মিশে একাকার। ফেলে আসা সময়ের পাতা উল্টে প্রথম ভাগে যাই সে আমার জন্মের পর, সামসিং চা-বাগানের দিনগুলোতে। মনে মনেই ফিরি, চেষ্টা করে দেখি, আমার স্নেহভাজন অমিতের আশা কতটা পূরণ করতে পারি।

আমার ছোটবেলা কেটেছে সামসিং পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির এক অংশ হয়ে — যেমন ঝোপ-ঝাড়-বনের নীল হলুদ বেগুনী ফুল; নানারঙের ছোট-বড় প্রজাপতি, পাখি-ঝর্না-ঝোরা-নদী-বন-পাহাড়-মেঘ-কুয়াশা-চাবাগান-কমলা বাগান। এই ছোটদের দলে মাইলী, সাইলী, মায়া, কাঞ্ছী, নছমন, মাইলা, কালে, সায়লা ও আমরা বাবুদের ছেলেমেয়েরা। তফাত ছিল না। ছিল বড়দের মধ্যে গন্ডিকাটা - এক গন্ডিতে ছিল সাহেব মেম বস বেয়ারা বাবুর্চি মালি আয়া কুকুর ঘোড়া ড্রাইভার। দূরত্ব রেখে ফুল-ফল-সবজিতে ঘেরা লাল টিনের চাল ও সবুজ কাঠের বাংলো। আর এক গন্ডিতে বাবুদের পরিবার নেপালি কাজের লোক মালী রাখাল। সে সকালে গোয়াল থেকে গরু নিয়ে চড়াতে যেত, বিকেলে ফিরে আসত। গোয়ালাও দুধ নিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকে পাত্রে দুধ ঢেলে চলে যেত সামনে কেউ থাকত না। বাবুদেরও ফুল-ফল-সবজিতে ঘেরা লাল টিনের চাল ও সবুজ কাঠের বাংলো। এই গন্ডিতে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, মাস্টার ও সুপারিন্টেডেন্ট অফিসের বাবুরা। সবার বাড়ি প্রায় একরকম ও কাজের লোকরাও। একই রকম নিয়মে চলত। বেশ দূরত্ব রেখে। একটা প্রচুর ফুলে ঘেরা হাসপাতাল। তার পাশের ঝোরাটা, তাকে আলাদা করে রেখেছে। বড় রাস্তা থেকে একটু চড়াই বেয়ে উঠতে হয়। আমরা মাঝে মাঝেই সেখানে হানা দিতাম, কাজিমলদাজুর কাছে। আবদার করতাম আমাদেরও অসুধ দাও। দাজু আমাদের সবাইকে লাল লাল সিরাপ এক চামচ করে করে সবার হা-করা মুখে খাইয়ে দিত। বস্তির বন্ধুরা আমাদের সাথে আসত না, ওদের ভয় করত — বলত সুই দিয়ে দেবে। আর এক গন্ডিতে চা-বাগানের কুলি, অফিসের কাজের লোক, পাহাড়ি পারিবারের অন্যান্যরা ও বাবুদের বাড়ির কাজের লোক। এরা ভোরে উঠেই মেয়ে-পুরুষরা তারে সংসারের কাজ সেরে যে যার কর্মস্থলে চলে যেত। কোন নেপালী নারী বাবুদের বাড়িতে কাজ করত; তারা সংসারের কাজ সেরে ছোট বাচ্চা থাকলে কাপড়ের ঝোলায় পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত চা-বাগানে। নিরাপদে কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে কাছাকাছি রেখে পাতি তুলত। যারা কাজে যেত না তাদের হাজার কাজ - একটু বড় বাচ্চার দেখাশোনা, ছাগল-গরু চড়ানো, জ্বালানি কাঠ জোগাড়। ঘাস কেটে পিঠে বোঝা নিয়ে উঁচু চড়াই থেকে নেমে আসত মেয়েরা। কুলিলাইনের গন্ডির বাইরে পাহাড়ের ওপর দিকের বস্তিতে অন্যের খেতেও কাজ করত। সেখানে কমলা বাগানে মাঝে মাঝে আমরা যেতাম। বস্তির লোকেরা খুশি হয়ে হাতে ও কোটের পকেটে এতো কমলা দিত যা আনাই মুশকিল হয়ে যেত, ঢাল বেয়ে নামার সময় অনেকে নামার সময় অনেকে পড়েও যেত। বাবুদের ছেলেমেয়েরা তাদের বস্তিতে এসেছে বলে সাড়া পড়ে যেত বস্তিতে। উপরের বস্তিতে বা আমাদের কুলিলাইনের বাড়িতে ঘরে কোনদিন তালা দিতে দেখিনি। খালি বাড়ি দরজা ভেজিয়েই চলে যেত দূরে দূরে কোথায়! বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে রাস্তা

সংক্ষেপ করার জন্য পাহাড়ে ওপর দিকে যাবার সময় কুলি লাইনের সরু সরু রাস্তা দিয়ে যেতাম, তবে ওদের বাড়িতে আমরা কোনদিনই ঢুকিনি। যেতে যেতেই দেখতাম কেউ বাসন মাজছে, কেউ পাথরের ওপরে কাপড়-চোপড় কাচছে কাঠের মুগুর দিয়ে। এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। বন-জঙ্গল-ঝোপঝাড়ে কত কী বুনো ফল পাওয়া যেত। ওরা চিনত সব। আমরাও ওদের সঙ্গে গাছের নিচে বসে বসে খেতাম সেইসব বুনো ফল। ওরা স্নান করেনা বা জামাকাপড়ও নোংরা এসব কিছুই মনে হত না। চা-বাগানের সরু সরু গলিতে খেলা। মূর্তি নদীতে পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে নদী পার হওয়ার প্রতিযোগিতা পর্যন্তই। আমরা ওদের বাড়িতে বা ওরাও আমাদের বাড়িতে কোনদিন আসা-যাওয়া করিনি। বড়রা কোনদিন তো নিষেধও করেনি। আমাদের ছোটবেলা ছিল — কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা! আমরা যেমন দল বেঁধে টইটই-এ বের হতাম, কিন্তু ওদের কাজ থাকত — গরু-ছাগল চরানো তাদের মায়ের সাথে ঘাস ও জ্বালানি কাঠ জোগাড়ে যেত। চলার পথে দেখা হলেই নানান কথা — বিপদে পড়লেও ওরাই উদ্ধার করত। যেমন সবাইকে হারিয়ে দেব বলে চোরাবাটো দিয়ে নামছি; হঠাৎ ঝোপ ও বড় বড় পাথরের মাঝে আটকে গেলাম, কিছুতেই বের হতে পারছি না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, বাঘের ভয়ে উঁচু এক বড় পাথরের মাথায় বসে আছি। গরু খুঁজতে এসে এক পাহাড়ি বন্ধু উদ্ধার করল। বলল - আগে জামাকাপড় খুলে ভাল করে ঝেড়ে নে। ওরা খুব ভূতে বিশ্বাস করত, কুলি লাইনের বাইরের রাস্তায় রাতে ভূতের পুজো করত পাহাড়িরা। আমাদের বাংলো থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে দেখেছি — তাই আমিও ছোট থেকেই ভূতে বিশ্বাস করি। আরো একবার এক বন্ধুর কথা ভোলার নয়। আমার স্বভাবমতো মূর্তি নদী পার হচ্ছি দল ছেড়ে পাথর থেকে পাথরে লাফ দিয়ে। এক শ্যাওলা ধরা পাথরে পা পড়তেই সরাৎ করে এক বিশাল পাথরের নিচে এক গলা জলে। আমার এই বন্ধু গরুকে জল খাওয়ানোর জন্য পাহাড় থেকে নামার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। আমার এই বন্ধুরা ওদের গন্ডির মধ্যে পাহাড়ে জঙ্গলেই বেশি ঘুরে বেড়াত ও গুলতি দিয়ে পাখি মারতে ও ধরতেই বেশি পছন্দ করত। যা আমাদের মোটেই ভাল লাগত না। এখানের লোকেরা খুব দারু (মদ) খেত; নারী-পুরুষ সবাই।

এখানের লোকেরা খুব দারু (মদ) খেত; নারী-পুরুষ সবাই। কুলি লাইনে মাঝে মধ্যেই খুব হল্লা, মারামারি হয়। স্বামী-স্ত্রীতে। মেয়েরা এক তরফা মার খায় না, স্বামীকে সেও ভাল মতো উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিত। সাধারণতঃ পুরুষদের থেকে মেয়েরাই বেশি পরিশ্রম করে দেখেছি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে নারীরা অনেকেই সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অন্য কোন প্রিয় জনের সঙ্গে গিয়ে নতুন সংসার পেতে ফেলত।

কুলি লাইনে মাঝে মধ্যেই খুব হল্লা, মারামারি হয়। স্বামী-স্ত্রীতে। মেয়েরা এক তরফা মার খায় না, স্বামীকে সেও ভাল মতো উত্তম-মধ্যম দিয়ে দিত। সাধারণতঃ পুরুষদের থেকে মেয়েরাই বেশি পরিশ্রম করে দেখেছি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে নারীরা অনেকেই সংসার, স্বামী, ছেলেমেয়ে ছেড়ে অন্য কোন প্রিয় জনের সঙ্গে গিয়ে নতুন সংসার পেতে ফেলত। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম হলে বিয়েতে অভিভাবকের যদি মত না থাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুজনে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধে। আর অভিভাবকের পছন্দ মতো বিয়ে হলে উৎসব শুরু হয়ে যায়, আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। পুরোহিত দিয়ে বিয়ে হয় নিয়ম মতোই, সানাই, ঢোল, সানাইয়ের মতো বিশাল লম্বা এক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে — বরযাত্রীও আসে, যার যেমন ক্ষমতা। পণের প্রচলন ছিল না। ভোজে থাকত ঢালাও মদ, শুয়োরের মাংস ভাত। বরযাত্রী, বর, কনের ডুলির আগে-পিছে বাজনা নিয়ে কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা পাহাড় থেকে পাহাড়ে। আর একটাও এই যাত্রা যেন দেখেছিলাম আবছা আবছা মনে আছে — একটা লম্বা কাঠের বা বাঁশের দন্ড, দুই প্রান্তে কাপড় বেঁধে দোলার মতো করে কনেকে বসিয়ে কাঁধে নিয়ে কনের শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। সে সময় রাস্তাঘাটের তেমন সুবিধা ছিল না। যেটুকু ছিল পাথর বিছানো। তাও সরু সরু। কেউ মারা গেলে কাঁধে করে শঙ্খ বাজিয়ে শ্মশানযাত্রা, সেখানে দাহ করে সাদা কাপড়ের নিশান লাগাত। ছোটবেলায় শঙ্খের আওয়াজে ভয় পেতাম। ওদের উৎসব দূর থেকেই দেখা, আমাদের

গন্ডি থেকে। তবে ওদের মুখে সুখ-দুঃখের কথা শুনলে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমন দুঃখিতও হয়েছি। বাবুরাও সাহায্য করেছে। ভাল কাজে বকশিস দিতে দেখেছি। সাহেবরাও বকশিস দিত। সাধারণতঃ পাহাড়বাসীরা গরীব ছিল, কিন্তু কারো কাছে কিছু চাইত না, ভিক্ষাও করতে দেখিনি। এরা খুব সৎ, ভদ্র ও বিনয়ী। লামা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করত, তখন অস্ফুট স্বরে কী যেন মন্ত্র পড়ত। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদও অন্যরকম ছিল। এখানকার লোকের মতো নয়। এই নেপালী নারীরা স্বাবলম্বী ছিল। তাদের স্বামীরা তাদের ওপর স্বামীত্ব ফলাতে পারেনি কোনদিন। ওরা খুব হাসিখুশি — ঝোরায় কাপড় কাচা স্নানের সময়ও দল বেঁধে চলতে চলতে গান, নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে হেসে একজন অর এক জনের গায়ে ঢলে পড়ত। বস্তি ঘরের বারান্দায় ঝোলান বস্তার দোলনায় বাচ্চাকে শোনানো বুড়ি আম্মার ঘুমপাড়ানি গান ‘লহই লহই লাথার কে...’ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে কী যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করত। এখনও ভাবলে মন ফিরে যেতে চায় আমার সেই ছোট্টবেলার দিনগুলিতে। রবিবার করে বস্তির নারীরা পিঠে ঝোলানো বেতের টুকরিতে মাখন, কোয়াশ, কমলা নিয়ে মেটেলী হাটে যেত। বাবুদের বাড়িতে কাজ করেনি কিন্তু নিয়মিত মাখন ও দুধ জোগান দিত মেয়েরা। ঝোরায় মেয়েরা স্নান করত। সেখানে পুরুষরাও কাপড় কাচত স্নান করত। ওদের স্নানের সময় দেখেছি লজ্জা শরমের বালাই ছিল না। তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক ছিল। রাস্তার ধারে কুলিলাইনেও বস্তির লোকরা জুয়া খেলত মদ খেত। কোন লুকোছাপা ছিল না। আমাদের বাড়ির কাজের লোকরা কোনদিনই মদ খেয়ে আসেনি। এই পাহাড়বাসীদের ফুটবল খেলা, মুরগীর লড়াই খুব পছন্দের ছিল।

ছোটরা ওদের লাইনের গলির মধ্যে ডাংগুলি খেলত। স্কুলেও কম যেত এরা। পাহাড়ের ওপর দিকে রেঞ্জার অফিস, এক মাইল নিচে সামসিং। সেখানে চায়ের গুদাম ও কারখানা। ওইসব জায়গাও আমাদর অনেক বন্ধু ছিল। সেখানে মাঝেমাঝেই খেলতে যেতাম আমরা। ওদের ডাকলেও যেত না ওরা। আমাদের মতো ওদের অত সময় ছিল না হয়তো। পাহাড়ের বস্তির ওপর দিকে আর এক সমাজ ছিল, তারা চা-বাগানে কাজ করত না। তাদের বাড়ি ছিল অন্যরকম। নিচের দিকটা মাটি ও পাথরের, ওপরের দিকে রেলিং ঘেরা বারান্দা। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠেই ঘরটাও কাঠের। বারান্দার ওপর দিকে বড় বড় ঠাকুর-দেবতার ও পরিবারের লোকেরা ফটো ও হরিণ বাইসন-এর শিং

দিয়ে সাজানো বসার জায়গা। বড় বড় ঘর সাজানো গোছানো। অনেকটা বাংলা টাইপের টিনের চাল দেওয়া। নিচের দিকে ভাল করে ঘেরা দেওয়া। সেখানে গরু ছাগল হাঁস মুরগী — চিতাবাঘের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এদের বাবুদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল। এক পরিবার ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার নাম ছিল অম্বরে রানা। আমরা দাজু বলে ডাকতাম। তার দাদুকে ডাকতাম বাজে বলে। ওপরের দিকের বস্তিতে একটা দোকান ছিল, সবাই বলত কাঁইয়ার দোকান। আমরাও তাই বলতাম। পরে জেনেছিলাম এরা মাড়োয়ারি। একটা স্কুলও ছিল বড় রাস্তার ধারে খেলার মাঠের ওপর দিকে; এক পাশে আমরা বাংলা ও ইংরেজি পড়তাম আর এক পাশে বস্তির ছেলেমেয়েরা পড়ত হিন্দি ইংরেজি। এখানের পড়া শেষ হলে ওরা দার্জিলিং বা কার্শিয়াং চলে যেত। যারা গরীব তাদের আর পড়া হত না, একটু বড় হয়ে বাবা-মা-র সঙ্গে বা এখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফিস বা নিচে সামসিং চায়ের গুদাম বা কারখানায় কাজ করত। অম্বরে দাজুও লেখাপড়া জানত। এই রানা পরিবারের মতো কমলা বাগানের ওপর দিকেও ওইরকম বাংলো টাইপের বাড়িঘর নিয়ে আরো পরিবার বাস করত। হাসপাতালে বা অফিসে যারা কাজ করত তাদেরও বাড়ি এই বস্তিতে বা কুলিলাইনের গন্ডিতে ছিল। পুজো-পার্বনও করত — নারায়ণ পুজো। দুর্গাপুজোর আগের দিন রামচন্দ্রের বনবাস থেকে রাজ্যে ফেরাকে স্মরণ করে আগে নারীরা ও পরের দিন ছেলেরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করত। ধনী দরিদ্র সবাই থাকত এই উৎসবে। দেওয়ালির দিন সারা পাহাড় আলোয় সেজে উঠত, প্রায় সবার বাড়িতেই দেওয়া হত আকাশপ্রদীপ। ভাইফোঁটার দিন ভাইয়ের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দই দুধ খাওয়াত বোনেরা। সেদিন ঢেউসিরে গান করে বাড়ি বাড়ি ঘুরত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা; অল্প অল্প মনে আছে গানগুলো - ‘বাবুকো ঘরমা ঢেউসিরে, চার আনাপইসা ঢেউসিরে, দিনুপরছা ঢেউসিরে।’ অনেকদিন আগের কথা, সুরগুলো কিন্তু কানে বেজে আছে এখনো। লক্ষ্মী পুজোর দিন আগে মেয়েরা ও পরের দিন ছেলেরা ‘ভাইলিসী’ উৎসব পালন করত গান করে করে পথ পরিক্রমায়। সব পুজো-পার্বণে উৎসবে সিয়েল বা সেল রুটি বানাত; সেটা দেখতে মোটা সোটা, গোল বড় নরম মিষ্টি জিলিপির মতো ভাজা। আর কোন মিষ্টি বা সন্দেশ কোন উৎসবে দেখিনি।

সেই সময় চা-বাগানে সাহেবদের কুঠি, বাবুদের বাংলো ও তাদের চলাচলের জন্য সুন্দর রাস্তা ছাড়া পাহাড়বাসীদের জন্য কোন সুযোগ-সুবিধে ছিল না। একটা হাসপাতাল ছিল সেখানে চা-বাগানের কুলিদের ও বস্তির লোকেদের চিকিৎসা হত। বস্তিবাসীরা বেশির ভাগ তাদের ঘরোয়া পদ্ধতি বা ওঝা, ঝাড়ফুঁক এসবেই বিশ্বাসী ছিল। সব হিন্দুদের

মতো এদের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা ছিল - উঁচু জাত নিচু জাত সবার হাতে জল খেত না সবাই, ঘরেও ঢুকতে দিত না। সেটা আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম।

ওদের নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল, আমি যেমন দেখেছিলাম সেগুলোই লিখছি। তবে নামগুলো জানা ছিল না। আমার এক ভোরের ভ্রমণসঙ্গী, নাম তার করন থাপা, তার কাছে জেনে লিখছি - মহিলাদের পোশাক চৌবন্দি চৌলা, গুনিউ, কোমরে পটুকা গায়ে ওড়না বা শাল। গয়না - কানে নাকে ডোংরি মুন্দি। গলায় কণ্ঠ, মঙ্গলসূত্র (বিবাহিতদের)। হাতে চুড়া। পায়ে বোলিচাঁদি। ছেলেদের পোশাক - দৌড়া শুরাল, কামি, সার্ট, কোট, টুপি, জুতা, কোমরে কুকরি। খাদ্য ছিল ভুট্টা, রুটি, মাংস, মাছ, ভাত। উৎসবে শুয়োরের মাংস, তবে শূকর কেউ পালত না; মদ খুবই খেত তবে মাতাল কমই দেখেছি রাস্তাঘাটে। এতে ওদের গোপনীয়তা ছিল না - অতিথি গেলেও এটাই দেওয়ার রেওয়াজ। নারী-পুরুষ সবাই ধুমপান করত ও মদ খেত। শীতপ্রধান জায়গা, প্রায় সবাই উল বুনত, বৃদ্ধরাও। নিজেদের জন্য।

বাবার রিটায়ারের পর বাড়িতে এসে দেখলাম এখানেও দুটো গন্ডি - ভেতর বাড়ি আর বারবাড়ি। এসেই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। স্কুলে যাওয়া আসার সময়ই বারবাড়ি দিয়ে যাতায়াত করা যেত। টইটই তো মোটেই নয়। মেখলিগঞ্জের নন্দীবাড়ির আইন ছিল খুব কড়া। এই বাড়ির কর্ত্রী ছিলেন আমার ঠাকুমা বরদাসুন্দরী; তাঁর কথাই শেষ কথা। বারবাড়ির কাজের লোকরা খাওয়ার সময় ভেতরবাড়িতে আসতে পারত ও উঠোনে বসেই ভাত খেত। ভেতর বাড়ির কাজের লোকেরা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে খেত। চা-বাগানের সাহেবরা সেখানে বাবুদের বাড়িতে কোনদিনও আসেনি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আসত বারবাড়ি পর্যন্তই। এই বাড়ির ছেলেরা সবাই শিকার ও ফুটবল খেলায় ওস্তাদ। সেই সূত্রেই সাহেবদের সঙ্গে খাতির ছিল। ভেতর বাড়িতে যে কাজের মহিলা ছিল, সে যে কাপড় পরত তাকে বলত ফোতা, বুকে বাঁধত মোটা রঙিন ডোরাকাটা কাপড়। সবসময় তার পানের নেশা - মজাগুয়া দিয়ে খেত, খুব বিশ্রী গন্ধ। সঙ্গের বটুয়াতে থাকত পানগুয়া, একটা কাটারি, গামছা। দাদা-কাকাদের সাথে আমাদের জোতে গিয়েও দেখেছিলাম সব বয়সের এ দেশীয় নারীরাই ফোতা পরিধান করত। রূপোর গয়না, গায়ে গামছা বাচ্চাদের। এই গামছা, ফোতা তারা নিজেরাই বুনত। পুরুষরাও তাদের বাড়িতে বা কাজে-কর্মে বেশির ভাগ সময়ে গামছাই পরত। বাইরে গেলে ধুতি, পাঞ্জাবি বা সার্ট, সাথে একটা গামছা। মজাগুয়া-পান এদের নেশা, সঙ্গে বিড়ি। হুঁকো। আমি তো বৃদ্ধাদেরও হুঁকো খেতে দেখেছি। অতিথি গেলে একটা রেকাবিতে আলাদা আলাদা করে পান, চুন, মজাগুয়া বা কাঁচা সুপুরি দেওয়ার রেওয়াজ। এদের প্রিয় খাদ্য শুটকি মাছ। এই মাছের নানান পদ দিয়ে ভাতই খেত। সে সময় এরা রুটি খেতে পছন্দ করত না।

কবিতা পাল

(লেখিকার জন্ম ১৯৩৭-এর ৩০ আগস্ট। বালিকাবেলা কেটেছে পাহাড়ের কোলে সামসিং চা-বাগানে)

এখন ডুয়ার্স নভেম্বর ২০১৪ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

শ্রীমতিদের উদ্‌যাপন

শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাবের প্রথম বর্ষপূর্তি ঘরোয়াভাবেই পালন করলেন শ্রীমতিরা

শালবনে রক্তের দাগ

আমাকে সনাক্ত করতে হল অনির্বান বসুর লাশ। কেন? তাঁর সঙ্গে আমার কি কোনও সম্পর্ক ছিল? অথচ সে আসলে এসেছিল আমাকে হত্যা করতে! আমি চিন্তায় পড়েছি। ওদিকে রুক্মিনী আসার সময় হয়ে গেল। নিখিল আমাকে জানাল যে সে পড়েছে কাঠ মাফিয়াদের নজরে। হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। তারপর রুক্মিনী এল। পেলব হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে। ওদিকে সত্যমের পুরোটাও জানতে ইচ্ছে করছিল আমার। জানতে পারব না। পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম প্রবল বৃষ্টিতে। সঙ্গে রুক্মিনী। সত্যমের পাচার চক্র ভুল করেছে কাজে। তারপর? এখান ডুয়ার্স পত্রিকায় **সাগরিকা রায়**-এর থ্রিলার।

(৯)

নিজের জিনিস দেখাতে ভাল লাগে। বিশেষ করে সেই জিনিস যদি অল্প বয়সী ছেলের কাছে থাকা অনন্যসাধারণ জিনিস হয়! সাপুড়েকে চমকে দিতে চেয়ে সাপটা দেখালাম। মনে পড়ে ঘোর দুপুর তখন। কৃষ্ণা পিসি উঠোনের তারে মেলে রাখা শাড়ি, জামা তুলে নিয়ে চলে গেল ঘরে। আমাকে বা সাপুড়েকে দেখতে পায়নি পিসি। লম্বা বিনুনী দুলিয়ে উঠোনের ওপর দিয়ে কৃষ্ণা পিসি চলে গেছে বলে তাড়াতাড়ি করে সাপটাকে দেখিয়ে দিলাম। লোকটার চোখ চকচক করে উঠল। লোভের চোখ চিনতে পেরেছি হয়ত সেদিনই। সাপুড়ে ঝট করে হাত ঢুকিয়ে দিল হাঁড়ির ভেতরে। কেমন কায়দায় সাপটাকে টেনে বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। পরে ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইল— ভাও কিতনা? দাম বাতা।

—ভাও? দাম? সাপের? মানে?

—কিতনা চাহিয়ে? ইয়ে সাপ মুঝে দে দে।

আমার খুব রাগ হয়েছিল। ততদিনে সাপটাকে ভালবেসে ফেলেছি ওকে বিক্রি করে দেব এই লোকটার কাছে?

দশ?

রাগ বেড়ে যাচ্ছিল। জবাব না দিয়ে আমি হাত বাড়ালাম— সাপটা আমাকে দাও।

লোকটা হাত সরিয়ে নিল। ওর মুঠোর মধ্যে সাপটা অস্থির হয়ে কিলবিল করছিল। বুঝতে পারছিলাম সাপটার কষ্ট হচ্ছে। আমার হাতে ও তো এরকম করে না! রাগে চেঁচিয়ে উঠব বলে হাঁ করেছি, লোকটা অদ্ভুত চোখে তাকাল— পন্দ্রো রুপিয়া?

পন্দ্রো? পনের? আটা টাকার সাপ পনের টাকায়? আমি বুঝতে পারিনি আমার চোখে সাপুড়ের চোখের ছায়া পড়েছে। সাপুড়েটা আমাকে ধরে ফেলেছে লোভের আঁকশি দিয়ে। ভুলে গেলাম এই সাপের বাচ্চাটা আমার খুব প্রিয়! আমি ওকে খুব ভালবাসি! শুধু মনে পড়ে সাপটাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে সাপুড়েটা। আমার হাতের মুঠোয় কয়েকটা টাকা কজ কজ করছে। সেই কজ কজ লোভের অনুভব চুম্বকের মতো এখনও টানে। এখনও। সেদিন টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বাগানের গাছপালার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিচ্ছিলাম,

বুক ধড়ফড় করছিল অতগুলো টাকা হাতে পেয়ে! বাগানের ভেতরে বসে থাকতে থাকতে হাসির শব্দ পেয়েছিলাম। কৃষ্ণা পিসির হাসি! মেসোর ঘর এদিকেই। পিসি হাসছে কেন? জানালা ধরে উঠে দাঁড়াতেই... পিসিকে মেসোর শরীরের নিচে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। মেসোর অনাবৃত শরীর ঢেকে রেখেছে কৃষ্ণা পিসিকে! ওরা কেমন এক অজানা দুনিয়া দেখিয়েছিল আমাকে সেদিন! এক দিনে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। সেদিনের সেই দুপুরে পৃথিবী তার রূপ রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছিল আমার কাছে। আমার সামনে। সেই সাপুড়ে আর মেসো আর পিসির ঘনিষ্ঠ ছবি একাকার হয়ে গেল আমার সামনে।

বাঘের খোঁজে এসে নিজেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম। শ্রমিক বস্তি থেকে, কাছাকাছি গ্রাম থেকে রাজ্যের লোক জন এসে ভিড় জমিয়েছে। ভিড় দেখে বাঘটা উত্তেজিত হয়ে আছে! দ্রুত পায়চারি করছে! ফরেস্টগার্ডরা সুবিধে মতো জায়গায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাকে দেখে ভিড়টা নড়ে উঠল। সমস্বরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। ফলে কারও কথাই শোনা যাচ্ছে না। মোড়ল টাইপ একজনকে খুঁজলাম যে আমাকে গুছিয়ে সব বলতে পারবে। বাঘটা এল কোথা থেকে! কেমন করে জঙ্গলের প্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ে?

রোগা লোকটি এসে হাউ হাউ করে নাগাড়ে কী সব বলে গেল। এক বর্ণ বুঝতে পারলাম না! বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারার লোকটি এগিয়ে এসে মোটামুটি ভাবে যা বোঝাল তা হল, খুব ভোরে, রাত থাকতে থাকতে একটা গাড়ি করে বাঘটাকে কারা নিয়ে যাচ্ছিল। কেমন করে বাঘটা গাড়ির ভেতরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল, সে জানে না। তবে শেষ রাতে প্রকৃতির ডাকে বাইরে বেরিয়েছিল। বাঘটাকে হাতি গাড়ি থেকে নামতে দেখেছিল। হাতি গাড়ি হল ছোট সাইজের ট্রাক। ককলকাতায় বেশি চলে। ইদানিং এদিকে আসছে। যাই হোক, বাঘের কথাই হোক। অন্ধকার ছিল বলে প্রথমে বাঘ বলে জন্তুটাকে চিনতে পারেনি। বুঝতে পেরে হাই মাই করে ঘরে গিয়ে ঢুকেই দরজা দিয়েছে। ফোন করে গ্রামের লোকদের দু'জনকে জানিয়েছে। এভাবেই ছড়িয়ে গেছে। কেমন করে রঙ্গালুর ঘরে ঢুকে পড়েছে, কেউ জানে না। ভাগ্যিস রঙ্গালু ঘরে ছিল না! মাঠে গিয়েছিল। দরজা খোলা ছিল। বাঘ ঢুকে পড়েছে।

—তারপর দরজা বন্ধ করলে কেমন করে?

—শম্ভু আড়াল থেকে লাঠি দিয়ে দরজাটা টেনে আনে। রঙ্গালুর বিছানা ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দিয়েছে বাঘটা। কী করিম! ওর বেলাক ওয়াইট টিভি ভাঙ্গি ফেলাইছে।

একটা শব্দ হল। ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়েছে গার্ডরা। বাঘ এখনই ঝিমিয়ে পড়বে! বিজনেসের ক্ষতি হল। ধ্যাসস!

(১০)

নিয়তির টান রয়েছে একটা। ভীষণ টান! জলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভারি ভাল লাগে নিখিলের। জেঠা সূর্য বর্মণ বলেছে একটা পাস হলে চাকরি পাওয়া সুবিধের। নিখিল বাঁধা ধরা কাজে আটকে থাকতে চায় না। জেঠার ছেলে কমল আর বিকাশ মাধ্যমিক পাস করে উচ্চ মাধ্যমিকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জেঠা বলেছে ওরা চাকরি পেলেই বিয়ে দিয়ে গুছিয়ে দেবে। নিখিলের মা, বাবা নেই। জেঠা ভালবাসে ভাইয়ের ছেলেকে। কিন্তু বনের গন্ধ টানে ওকে! আর সেই টানে

বাঘের খোঁজে এসে নিজেই ঝামেলায় পড়ে গেলাম। শ্রমিক বস্তি থেকে, কাছাকাছি গ্রাম থেকে রাজ্যের লোক জন এসে ভিড় জমিয়েছে। ভিড় দেখে বাঘটা উত্তেজিত হয়ে আছে! দ্রুত পায়চারি করছে! ফরেস্টগার্ডরা সুবিধে মতো জায়গায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

জঙ্গলের ভেতরের ঝোরা, গহীন অরণ্য নিখিলের কাছে হাতের তালুর মতো। প্রতিটি রেখা চেনে নিখিল জঙ্গলের। আর যখন মেঘ করে আসে, তখন বন কেমন সুন্দর দেখায় সেটা নিখিল কাউকে বোঝাতে পারে না। ময়ূর নাচে! খুব খুশি হয় ময়ূর ম্যাঘ দেখিলে! পড়াশোনায় সেই মজা কোথায়? নিখিল আমাকে প্রশ্ন করে ভ্রু তুলে।

—আর বৃষ্টি হলে?

—সে না বলিবার পারিম। কী যে ভাল্লাগে! নিখিল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

রুক্মিণী আমাকে সারাদিন কাছে পাচ্ছে না বলে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। চলে গিয়েছিল ফুন্টশোলিং। এল যখন, রাত হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে ইশারা করল। এই ইশারা চিনি। ভুটানি মদ নিয়ে এসেছে। ওর খুবই প্রিয়। এই বৃষ্টি ঝরা রাতে ঝুম ঝুম হয়ে যাওয়া... আহ্!

রাতে চিকেন পকোড়া আর মদ নিয়ে বসেছি। ঘরের আলো কমিয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি বসেছি। বাইরে বারান্দায় বসে গান ধরেছে নিখিল। মন দিয়ে কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করছি।

'ও দয়ার রে, হাউস করি তুই দুনিয়া বানালু/ তাকে দেখির তানে তুই মোকে বসালু রে দয়াল...'! হে প্রভু, কত সাধে দুনিয়া বানালে / তোমার সাধের দুনিয়া সামলাতে আমাকে পাঠালে হে দয়াল। নিখিল গায় ভাল। কেমন একটা গন্ধ আসছে নাকে! নাক উঁচু করে শ্বাস টানি। কিসের গন্ধ? এই গন্ধটা বহু বহু যুগ আগের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে! আরে, এটা কিসের গন্ধ? অ্যাই, কে আছিস? এটা কিসের গন্ধ রে? নাঃ, নাঃ, আমি বুঝতে পারছি না কেন? ধরতে পারছি না কেন? অ্যাই! অ্যাই! অ্যাই শালা বানচোত! শালা খানকির বাচ্চা! গন্ধটা আসছে কোনদিক থেকে? আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে! মদের গেলাস হাতে নিয়ে আমি গন্ধ খুঁজতে বের হলাম। দরজা খুলতেই বর্ষার রঝলক বাতাস মুখে ঝাপটা মারল। বাইরে গন্ধটা তীব্র! এদিকে... না, ওদিকে, ওই দিকে, যেখানে নিখিল বসে আছে...! আমাকে দেখতে পায়নি নিখিল। চোখ বুজে গান গাইছে। এখানে, এই খানেই গন্ধ বসে আছে! নিখিলের গা থেকে গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে! থম মেরে ওকে দেখে যাচ্ছি! ছেলেটার গায়ে মানুষ মানুষ গন্ধ!

কথা বলতে পারলাম না! ছেলেটা গান গাইছে। মন খুলে গাইছে! ওকে গাইতে দাও। ডিস্টার্ব নয়! এই মোহময় বৃষ্টির রাতে ওর দয়াল ওর সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকি। হাঁটতে থাকি! কতদূরে যাব আর! কত হাঁটব হে দয়াল! কোন দিকে যাব? নিখিলের দয়াল কথার জবাব দিলেন না। তোড়ে জল নেমেছে। বৃষ্টির ধারার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ সুরে ডাক এল —সুভদ্র...ও...ও!

চমকে জেগে উঠলাম! রুক্মিণী ডাকছে! এ ডাক পাইথনের ডাক। সম্মোহনের ডাক! একে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করার সাধ্য নেই আমার! আমাকে পেছনে ফিরে সেই ডাকে সাড়া দিতে হবে। গেলাস খালি হয়ে গেছে কখন! মদ কোথায় রুক!

—তুমি... কোথায় গিয়েছিলে ডিয়ার! আমাকে একা ফেলে যাবে না। রুক্মিণী আমার বিছানা দখল করে শুয়ে আছে। ওর পেলব লতার মতো শরীরে রাত পোশাক ব্ল্যাক আর অ্যাশ কালারের হওয়ায় নেশার চোখে ওকে মনে হল সেই পাইথনটা! কুতকুতে চোখে দেখছে আমাকে! নড়েচড়ে উঠছে বিছানায়! দু' পা পিছিয়েই থমকে গেলাম। সেই পাইথনটার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শ্যামল। রাতারাতি পাচার করে দিয়েছে ওটাকে। যে-ই আমাকে ভয় দেখাতে

চেষ্টা করুক না কেন, একদিক দিয়ে বিরাট উপকার করেছে। দু'জন অস্ট্রেলিয়ান জলদাপাড়ায় এসেছে। শ্যামলের জিগরি দোস্ত ওরা কেমন করে হল জানি না। কিন্তু সেই রাতে শ্যামলের ফোন পেয়ে চলে এল দু'জন। যাওয়ার সময় গেল তিনজন। একজন আবার সুদৃশ্য কার্ডবোর্ডের বাক্স করে। আমি কোনও ব্যাপারে নাক গলাইনি। কেবল ওরা চলে যেতে নিখিলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেছি বেডশিট পালটে দিতে! মধ্য রাতে বেডশিট পালটাতে গিয়ে নিখিল হয়ত অবাক হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করেনি। না করুক, কিন্তু আমি জানি, এই নিয়ম বহির্ভূত ঘটনাটা মনে থাকবে নিখিলের। এই ধরনের স্মরণশক্তি... ধুস, আমার পছন্দ না। একেবারেই না!

বিছানা থেকে নেমে আসছে পাইথন! স্খলিত খোলস, কুতকুতে চোখে মদালসা চাউনি, পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরছে আমাকে! উফ্! দম আটকে আসছে! আঃ ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে! নয়ত গলা কেটে নেব! রুক, উফ্ ছাড়ো!

পাঞ্জাবি পুরুষের মতো করে হেসে উঠল রুক্মিণী। গেলাস থেকে উচ্ছিষ্ট মদ ঢেলে দিল আমার গায়ে।

বোধহয় রেগে চেঁচিয়ে উঠেছি। রুক্মিণী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে —শ শ, চুপ, কেউ আসছে!

থমকে গিয়ে বাইরের আওয়াজ পাওয়ার জন্য সমস্ত অনুভূতি একীভূত করছি। হ্যাঁ, কেউ বাইরে আছে! আমার দরজায় কান পেতে আছে। কে? আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। রুক্মিণী ভয়ার্ত গলায় ফিসফিস করে উঠল —নো, দরজা খুল না! ওদের কাছে আর্মস আছে!

ওর কথায় কান দিলে চলবে না। স্পষ্ট শুনেছি কেউ হেঁটে চলে গেল বাইরে! একটা কথা মনে হতেই চমকে উঠেছি। সাপ! কেউ সেদিনের মতো সাপ ফেলে গেল কি? বা বিষাক্ত বিছে! আমি বাইরে বের হলেই...! দরজার মুখেই অপেক্ষা করছে যম? তাহলে কি দরজা খুলব না? শ্যামল কোথায়? সেই অস্ট্রেলিয়ান বা অ্যামেরিকান যাকে পারুক নিয়ে আসুক শ্যামল। শত্রু আমার ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে আসছে! হা হা হা! শ্যামলকে ফোন করতেই অনেক পরে ফোন রিসিভ করল— ও এখানে নেই। নিমতিঝোরায় আছে। কিছু কাজ আছে। তাই ওকে ওখানে যেতে হয়েছে।

কাজ আছে সে আমিও জানি। কিন্তু এখন... নিখিলকে ডাকি?

নিখিলকে ডেকে হবে না। ব্যাটা ঘুম কাতুরে। ফোন! হ্যাঁ, ফোন করতে হবে। শ্যামলের গলা জড়ানো ছিল। সেটা কি ঘুমিয়ে ছিল বলে? নাকি...! এত রাতে শ্যামল জেগে আছে! নেশায় মত্ত? একা? ও নিমতিঝোরায় গেল কখন? আমাকে জানিয়ে যায়নি তো!

রিং হচ্ছে! নিখিল এত ঘুমোচ্ছে? ফোন ধরছে না কেন? ছ'বার, সাত, আট... ফোন করেই চলেছি। নিখিলের ফোন বেজেই চলেছে! নিখিল ফোন ধরল না!

> তুমি...
> কোথায় গিয়েছিলে ডিয়ার!
> আমাকে একা ফেলে যাবে না। রুক্মিণী
> আমার বিছানা দখল করে শুয়ে আছে। ওর
> পেলব লতার মতো শরীরে রাত পোশাক ব্ল্যাক
> আর অ্যাশ কালারের হওয়ায় নেশার চোখে ওকে
> মনে হল সেই পাইথনটা! কুতকুতে চোখে দেখছে
> আমাকে! নড়েচড়ে উঠছে বিছানায়! দু' পা
> পিছিয়েই থমকে গেলাম। সেই পাইথনটার
> ব্যবস্থা করে দিয়েছে শ্যামল।
> রাতারাতি পাচার করে দিয়েছে
> ওটাকে।

(১১)

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে একটা আলোচনা সভা ছিল শিলিগুড়ি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে। নেচার লাভার বলে আমার নাম পাঁচজনে জানে। তো, সেখানে বক্তব্য রাখতে হবে। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সচেতন। বিকেলে সভায় পৌঁছে বক্তব্য রাখলাম। ডুয়ার্সে চা বাগান ঘেরা জায়গা বীরপাড়ার লুকনো বাজারে রামু মন্ডল ঠিক সন্ধে বেলায় নদীর মাছ নিয়ে বসে। খদ্দের ভাল আছে ওর। মাছ কেটেকুটে দেবে না। বড় মাছ কখনও থাকলে কেটে দেয়। কেউ কেউ রামুর কাছে গিয়ে নিচু স্বরে 'আছে নাকি?' জিজ্ঞাসা করলে রামু চোখের ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে। তারপর রামুর ভাই কাস্টমারকে নিয়ে মাছ ভর্তি সিমেন্টের স্ল্যাবের পিছনে যাবে। ছোট ছোট গামলায় জল ভরা। তাতে খেলছে কচ্ছপ। দেখেশুনে পছন্দ হলে দাম দস্তুর করে ওজন হয়ে গেলে মাছের আঁশবটিতে কেটে দেবে রামু। কেটে খোলস ছাড়িয়ে পিস করে প্যাকেট করে কাস্টমারের হাতে দেবে। এদের পসরা নিয়ে জমিয়ে বসেছে রামু। শীত পড়ার শুরু থেকে চাহিদার পাশাপাশি জোগান বাড়বে। ছশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হবে। এরপর জোগানের পাশাপাশি দাম কমবে। তিনশো টাকায় নেমে আসবে। শীতে বাড়ে কচ্ছপ। জল পেরিয়ে ডাঙায় এসে ধরা দেবে তারা। প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে প্রজাতির কচ্ছপ বাজারে বিক্রি হচ্ছে, সেটা বিপন্ন প্রজাতির। এটি অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই ভাবে হত্যা বা বিক্রি করলে। কচ্ছপ বিক্রি করা দন্ডনীয় অপরাধ। জলজ-প্রাণী বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাজারে যে প্রজাতির কচ্ছপ বিক্রি হচ্ছে, সেটা বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আইনের শিডিউল ১-এর ধারায় পড়ে। এই আইনের আওতায় বাঘ রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঘ হত্যার সমান অপরাধ হল এই কচ্ছপ বিক্রি করা! কিন্তু মানুষের লোভের কাছে সব আইন তুচ্ছ! মাল আসবে কোথা থেকে? ডুয়ার্স জুড়ে কেবল নয়, কলকাতার শহরতলি এলাকায় এর বিরাট বাজার আছে। মাল আসে ট্রাকে করে। এখন কথা হল, কী বলছে বন দপ্তর? বনাধিকারিক জানালেন, এইরকম কোনও খবর তাঁর কাছে নেই! তিনি নিয়ম করে বাজারে টহল মারেন। কিছু জানতে পারেননি। এবারে যখন জেনেছেন, ব্যবস্থা নেবেন। নাকের ডগায় যা ঘটছে, সে সম্পর্কে উনি কেমন করে উদাসীন, জানি না! আরেকটা মজার খবর হল, থানাও এ ব্যাপারে কিচ্ছুটি জানে না। এই ধরনের রেইডের ক্ষেত্রে থানার হেল্প লাগে বন দফতরের। থানা বলছে, খবর পেলে আমরা তখনই অ্যাকশন নেব। খবর কি একেবারে থাকে না? রেঞ্জ অফিসের এক কর্মী জানিয়েছে, খবর আসে। কিন্তু এসব কাজে উদ্ধার কাজের জন্য দরকার হয় বিশেষজ্ঞ, গাড়ি, যন্ত্রপাতি...। সে সবের অভাব বলে পদক্ষেপ নেওয়া মুশকিল। অর্থাৎ? পরিকাঠামোয় খামতি রয়েছে। সবচেয়ে আগে মানুষের সচেতনতা চাই। এরপর ডুয়ার্স থেকে পশু পাচার চলছেই। সম্প্রতি পাচার চক্রের পান্ডাকে ধরা হয়েছে শিলিগুড়ির কোনও এক হোটেল থেকে। মালবাজার থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ক্রেতা সেজে দরদাম করে। চিতা বাঘ সম্ভবত পাচার হচ্ছিল বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। এগুলো নিয়ে সক্রিয় হতে হবে।

বক্তব্য রেখে আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। কাজটা সেরে তাড়াতাড়ি এয়ারপোর্ট চলে এলাম। কলকাতায় যেতে হবে। আমার কিছু ইমপর্ট্যান্ট কাজ আছে।

আর তাই কলকাতায় পা রাখছি...।
কলকাতায় এলে ভালই লাগে। পড়াশোনার দুটো বছর এখানে কাটিয়েছি। কেমিস্ট্রি আমার কাছে একটা মিস্ট্রি। লর্ডসের মোড়ে নেমে মার্কেটের ভেতরে ঢুকে বাঁ দিকে চলে গেলাম। গলির গলি তস্য গলি পেরিয়ে সরু গলিতে ঢুকে পড়লাম। ডেনজং কিচেন পেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা থেকে খানিক নিচুতে নিঝুম কিছু ঘর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আমার গন্তব্য ওই ঘরগুলোর পেছনের সরু গলির শেষপ্রান্তে। কাঁচা ড্রেন। দুর্গন্ধে পেট মোচড় দিয়ে উঠল। কিছু করার নেই। যেতেই হবে। গেলাম। এখানে রাঘব নামে একটা লোক থাকে। ওকে দরকার! অনেক বারের মতো এবারেও দরকার।
তুঁতে রঙের কাঠের দরজায় ঘুণ ধরেছে। দরজার মুখে রং-চটা প্লাস্টিকের বালতি। দরজার কাঠ জলে ভিজে আছে। একই রকম রয়ে গেল রাঘব। যা ইনকাম করে, তার সবটাই নেশায় উড়িয়ে দেয়। টোকা দিতে দরজা খুলে গেল। একটি অল্প বয়সী যুবতী দরজায় হাত রেখে ভ্রু কুঁচকে তাকাল। ফর্সা লম্বাটে মুখে ব্রণ, চোখে কাজল ধেবড়ে আছে, চুলগুলো উঁচু করে চওড়া ক্লিপে আটকে রাখা। সরু কোমর ঘিরে ছোট ছোট পুঁতি দিয়ে গাঁথা রুপোর চেন। যৌবন ছলছল করছে নদীর মতো। আমি বোধহয় এক পলকে সবটুকু দেখে নিয়েছিলাম। হাফ অ্যান্ড হাফ প্রিন্টেড শাড়িতে জলের ছোপ। হয়ত রান্না করছিল। কিন্তু এ কে? আগেও এখানে এসেছি। এই মহিলাকে দেখিনি।
—কাকে খুঁজছেন? গলার স্বরে চিনি কম।
—রাঘব!
—ও এখানে থাকে না।
—থাকে না! কোথায় থাকে?
—স্মোক সেক-এ।
—স্মোক সেক!
—কালীঘাট?
—হ্যাঁ। কালীঘাট থেকে বাঁ দিকে... পার্ক প্লাজা।
—আচ্ছা!
আমি বুঝতে পারছি না রাঘব ওখানে কী করছে! ওখানে এর আগে অনেকবার ওর সঙ্গে স্মোক সেকের ওপেন এয়ারে মিট করেছি। ওহ, রাঘবের ফোন নম্বর আছে। ডিলিট হয়ে যায়নি তো? সাধারণত রাঘবের সঙ্গে ফোনে কথা বলা মানে সময়ের অপচয়। এত বাজে বকতে পারে লোকটা! নেই মানে একবার ফোন করে কন্ট্যাক্ট করে নিই।
বার কয়েক চেষ্টার পরে ফোন ধরেছে রাঘব। মদে চুর। আমার নাম সেভ করে রেখেছে বলে ফোন অন করেছে।
—হ্যালো রাঘব। আমি বলছি।
—বলুন, কাজ আছে কোনও?
—আছে বলে তোমার কাছে এসেছি। তুমি কোথায় আছ?
—বলেনি আমার দীপিকা? আমি পুরনো জায়গাতে বসে আছি। একটা কাজের জন্য ফুল পেমেন্ট পেলাম। দিল খুশ। এখন বলুন।

> সত্যম দাশগুপ্ত আলিপুরদুয়ারে আসছে। উদ্দেশ্যটা কী জানি না। বিনা উদ্দেশ্যে সত্যম আসছে না! কাকে ফের টার্গেট করে আসছে সত্যম? আমি সত্যমের থেকে একটু দূরত্ব রাখতে চাই। যে ভাবে পাচার চক্রে মেতেছে সত্যম, যে কোনওদিন ঝামেলায় পড়ে যাবে। ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়। সত্যম মেয়ের কাছে থাকবে কি? তাহলে আমার ঘাড়েই এসে উঠবে। উফ্!

—তুমি চলে এস। তোমার পুরনো আড্ডায়। কথা আছে।
—আপনিই আসুন না! কাজের কথা ঘরে হয় না। দীপিকা আছে।
এই মেয়েটিকে রাঘব বিশ্বাস করতে পারছে না। লাইনটাই এমন! কে যে পেছন থেকে ছুরি মারবে বলে দাঁড়িয়ে আছে! এরপর আছে পুলিশের খোঁচড়। পুলিশ কার পেছনে কাকে লেলিয়ে দিচ্ছে, কেউ জানে না!
পার্ক প্লাজায় পৌঁছে ওপেন এয়ারে চলে গেলাম। আরাম করে বসে ওয়াইন গিলছিল রাঘব। আমাকে দেখে হাত তুলল।
—রাঘব, ঘরে মেয়েটা কে? মিথ্যে বলল তুমি ওখানে থাক না। আগে ওকে দেখিনি! আগের মেয়েটি কোথায়? কী নাম... জয়া।
—ওটা খোঁচড় ছিল স্যার। যেদিন ধরে ফেলেছি, সেদিনই পাচার করেছি।
—পাচার? পুলিশের ইনফর্মারকে পাচার?
—পুলিশ? নেশাতুর চোখে তাকাল রাঘব —পুলিশ খুঁজে পায়নি! এমন জায়গায় পাচার করেছি, আর লোটেঙ্গে নেহি!
—মানে?
হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় রাঘবকে। হাসি থামিয়ে অন্য কথা বলল— হাওড়ার একটা ভাগাড় পুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শালা! দু'মাস ধরে আগুন জ্বলে যাচ্ছে। দশতলা সমান উঁচু নোংরা পুড়ছে তো পুড়ছে। ফের নতুন করে ময়লা চলে আসছে! সাফাই করতে জান চলে যাচ্ছে!
—তুমি এখন ওখানে সাফাই কর্মী?
—কাজটা নিয়েছিলাম আমার দোস্ত ইয়াকুবের থেকে। ওকে বললাম দুটো দিন কাজটা আমাকে দে। ওর সঙ্গে ভাল বোঝাপড়া আছে! ওর হয়ে প্রক্সি দিলাম দু'দিন। শেষ রাত থেকে ওখানে কাজ করেছি। আগুন শালা জ্বলে যাচ্ছে। বডি পুড়িয়ে দিতে আর কতক্ষণ লাগে? এক ঘণ্টা? এমনি যা বদ গন্ধ ওখানে! আলাদা করে একটা মেয়েছেলের বডির গন্ধ কে টের পাবে?
তো আপনার কাজটা বলুন।

(১২)

আজকের সকালটা ভারি সুন্দর। নরম রোদে ভরে আছে আকাশ। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি। আমার ই এম বাইপাসের বারো তললার ফ্ল্যাটটা আরামদায়ক। বিশেষ করে ব্যালকনিটা। মধ্যরাতেও ব্যালকনিতে বসে আড্ডা দেওয়া যায়। সারারাত ধরে আলোয় মাখা শহর ছুটে যায় কোন এক অচেনা ঠিকানায়। অজস্র গাড়ির আলো রাতের অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটছে নিজের নিজের গন্তব্যে। গতকাল রাতভর আর্সালান-এর পাশের রেস্টুরেন্টে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে। আমি সেখানে সরাসরি হাজির ছিলাম না। ফোনে কথা হয়েছে রাঘবের সঙ্গে। রাঘব ওর একজন হেল্পারকে নিয়ে এসেছিল। আমি চাইনি সেই লোকটা আমাকে দেখুক। চিনে রাখুক।
নাঃ কালকের কথা কাল হয়ে গেছে। আজকের সকালটা বরং দেখি। কেমন চমৎকার পবিত্র আলো ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে শহরের শরীরে। ধীরে নয়, ঝট করে জেগে ওঠে শহর কলকাতা। স্পীড... স্পীড...! অল্প কিছুক্ষণ এই আরাম উপভোগ করা যাবে। এরপরে আগুনের হলকা ছুটবে। আজকের তাপমাত্রা কত? গতকাল ছিল ঊনচল্লিশ ডিগ্রি। এসি ছাড়া বাঁচা যায় না! তবে কলকাতার একটা মোহ আছে। এই মোহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব প্রায়। মাঝে মাঝে মানুষ আর মানুষ, স্পীড আর স্পীড দেখতে দেখতে বৃষ্টি ভেজা ডুয়ার্সের

শাল কাঠের খুঁটির ওপর আমার কাঠের টিনের চালওলা বাড়িটা ডাকতে থাকে আমাকে। কিন্তু এখনই যেতে পারছি না ডুয়ার্সে। কাল যাব ডুয়ার্স তোমার কাছে। ততদিনে রুক্মিণী ভুটান থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসবে! প্রস্তাবটা আমিই দিয়েছিলাম। কাজ আছে কলকাতায়। মাত্র দু'দিনের কাজ। তো রুক বসে বসে সময় অপচয় না করে কোথাও ঘুরে আসুক। খয়েরবাড়ি, কী চালসা, বা ধূপঝোরার গাছবাড়িতে থেকে আসুক। ওর দারুণ কাটবে সময়। রুক বেড়ানোর জন্য বেছে নিল ভুটান। ভালই হল। দু'জনেই সময়টা নিজের নিজের মতো করে কাটাচ্ছি। রাঘবের ওপর দুটো কাজের ভার দেওয়া আছে। একটা গতকাল দিয়েছি। আজ একটা দেব। মেয়েটাকে শ্যামল এখনও খুঁজে পায়নি। অথচ ওই মেয়েকে আমার চাই। আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকে বোকা বানিয়ে উধাও হয়ে গেল! এর শেষ না দেখে ছাড়তে পারি না! আজও জানতে পারিনি মেয়েটা কে! কে ও! কেন সেদিন রাতে আমার বাড়িতে এসেছিল? কেনই বা পালিয়ে গেল? ওকে খুঁজে বের করে তারপরে অন্য কাজ! অনির্বাণ বসুর ব্যাপারটাও আমার বোঝা হয়নি! সে কে ছিল? কেন আমাকে মারতে চেয়েছিল সে? বড় মাথা আছে এর পেছনে। সেই মাথাটাকে খুঁজে চলেছি। শ্যামল পারছে না। ওর হেল্পার চাই।

সত্যম দাশগুপ্ত আলিপুরদুয়ারে আসছে। উদ্দেশ্যটা কী জানি না। বিনা উদ্দেশ্যে সত্যম আসছে না! কাকে ফের টার্গেট করে আসছে সত্যম? আমি সত্যমের থেকে একটু দূরত্ব রাখতে চাই। যে ভাবে পাচার চক্রে মেতেছে সত্যম, যে কোনওদিন ঝামেলায় পড়ে যাবে। ওর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়। সত্যম মেয়ের কাছে থাকবে কি? তাহলে আমার ঘাড়েই এসে উঠবে। উফ্!

মোবাইলে মেসেজ চেক করছি। প্রথমেই রুক্মিণী! হাই ডার্লিং! মিল্ক শেক নিচ্ছি। একটা শপিং প্ল্যান করছি। কাম সুন।

দরকারি কিছু মেসেজ নেই। শ্যামলকে যে প্রোগ্রামটা করতে দিয়েছিলাম, সেটা করে উঠতে পারেনি। ওকে আশ্বস্ত করতে মেসেজ নয়, ফোন করলাম। আমাকে না জানিয়ে ওর এগনো উচিত হবে না। শ্যামল কয়েকটা খবর দিল। রুক্মিণী ফিরে এসেছে। আমার বাড়িতে আছে। আজ অনেকক্ষণ ট্রেড মিলে ছিল। ওর বাবা আসছে আজ। রুক্মিণী বাবার রুম গুছিয়ে দিতে বলেছে নিখিলকে।

—ওহো, নিখিলের খবর বল। কেমন আছে ও? মাফিয়ারা হুমকি ফোন পেয়েছে আর?

শ্যামল একটু চুপ করে থাকল। তারপর ফোনের ওপারে হাসির শব্দ পেলাম। শ্যামল হাসছে —হ্যাঁ, ভালই আছে। আজ ঝুরঝুরে খিচুড়ি খেতে চেয়েছে রুক্মিণী ম্যাডাম। সঙ্গে ফিশ ফ্রাই, কুড়মুড়ে আলুভাজা। নিখিল সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। ম্যাডাম নাকি নিখিলের হাতে ব্ল্যাক কফি খেয়ে খুব খুশি। বলেছে, নিখিলকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আর নিখিলের খুশি দেখে মনে হচ্ছে ও কোনও ফোনটোন আর পায়নি!

—হা হা হা! শ্যামলের বলার ধরনে হেসে ফেললাম। শ্যামল ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান ছেলে। উচ্চাকাঙ্খা আছে। ইচ্ছে শিলিগুড়িতে মার্কেটের কাছাকাছি একটা থ্রি বিএইচকে ফ্ল্যাট কেনার। মাঝে মাঝেই সিকিমে যায়। ওর নাকি ভাল লাগে সিকিম। কিন্তু কেবল ভাল লাগার জন্যই উইকডেডে সিকিম যাওয়া... এক কি দু'দিনের জন্য...! প্রেমিকা আছে? উঁহু! প্রেমের গন্ধ অন্যরকম হয়! শ্যামলের মধ্যে চোরা ছায়া দেখতে পাচ্ছি। সিকিমে সাদা গুঁড়োর পুরিয়া পাচার করলে প্রচুর টাকা পাওয়া যায় বলে জানি। শ্যামল অর্থলোভী সেটা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। ওর অন্য কোনও ধান্দা আছে। সেটা কী জানতে হবে শ্যামলকে বুঝতে না দিয়ে! রাঘবকে শ্যামলের পেছনে লাগিয়েছি। শ্যামল আমাকে লুকিয়ে কিছু করে চলেছে। সেই বিষয়ে আমাকে অন্ধকারে রাখবে! উঁহু শ্যামল, সেটা হবে না! আমাকে অন্ধকারে রাখতে পারবে না! আহা কলকাতা! একটু বৃষ্টি দাও! রাঘবের ইউজ করা বৃষ্টি নয়। সেই মেয়েটা কোথায় গেল যে! রাতে দরজায় এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে সাক্ষাৎ রতিদেবীকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। মন ঝুম ঝুম করে উঠেছিল। ঝুম ঝুম! কে গেয়েছিল গানটা? ঝুম ঝুম রাত নিঝুম... ঝুম ঝুম রাত নিঝুম...! গানের পরের লাইনগুলো শ্লা মনেই পড়ল না! সারাক্ষণ কানের কাছে র‍্যাটল স্নেক নেচে যাচ্ছে। ঝুম ঝুম ঝুম... সেদিন রুক্মিণীর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম, তখন বাইরে কার পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম? কেউ চুপি চুপি পালিয়ে গেল! রুক্মিণী ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল —দরজা খুলো না। ওদের কাছে আর্মস আছে! ওদের বলতে কাদের কথা বলেছিল রুক্মিণী? কেনই বা আমার দরজায় আর্মস নিয়ে দাঁড়াবে তথাকথিত ওরা? অনেক প্রশ্নের উত্তর নেই! কিন্তু সেদিন আমার বাড়িতে একজনের পায়ের আওয়াজ পেয়েছি আমি। বাড়িতে নিখিল ছাড়া আর কেউ ছিল না। নিখিল কান পেতে কী শুনতে চেয়েছিল আমার ঘরে? ওর ভেতরে কি সুপ্ত আকাঙ্খা রয়েছে? নারীর প্রতি কৌতুহল? নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রতি অনুসন্ধিৎসা? নাকি অন্য কিছু?

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্স থেকে শুরু

নিষ্কলুষ কালিমা

মানিক মন্ডল এলেন এবার। কে সে? কী করে? কেনই বা তাঁর প্রতি লেখকের ভিন্ন টান জন্মায়? বিজ্ঞাপণের বার্তা নিয়ে হেঁটে বেড়ান রণ পা পরা লোকগুলোর সঙ্গে কী সম্পর্ক এই পর্বের? ব্যক্তিগত সম্পর্কের রসে জারিত এই পর্বটি আসলে লেখকের প্রথম বয়সের এক অংশ যেখানে ট্রেডল মেশিন, ছাপার কালির গন্ধ, লিনো শিটে আঁচড় —এ সব লেগে আছে। আর আছে এক অতি কাছের মানুষ। কিন্তু সে মানুষ মানিক মন্ডল নন। এই রহস্যের পর্দা তুলতে হলে পড়তেই হবে এই লেখার বর্তমান অংশ। জীবন এক পরম রহস্যময় বস্তু। এ রহস্যে ইংরেজি অনুবাদ চর্চা দিব্যি মিশ খেয়ে যায়।

সকাল দশটার উল্টোডাঙা মোড়। থিকথিক করছে যানবাহন ও জনতার স্রোত। সেই সময় হঠাৎ রাজপথ জুড়ে মহা সোরগোল সহকারে এগিয়ে আসতে লাগল এক দল লোক। যারা প্রত্যেকেই হাঁটছে রণ পা চড়ে।

দৃশ্যটি যথেষ্ট অভাবনীয়। এবং সেটা দেখে, এই মুহূর্তে ঠিক কত লোকের যে চক্ষু চড়কগাছ, তার সঠিক গুণতির জন্য রীতিমত আদমসুমারি দপ্তরের সহায়তা প্রয়োজন। ল্যাম্পপোস্টের চেয়ে উঁচু সেই মানব সারির প্রতিটি সদস্যই ঢোল, ভেঁপু বা কাঁসর জাতীয় কোনও না কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। জানুয়ারির রোদ এখন কিছুটা নরম প্রকৃতির। সেই আলোতে ঝলমল করছে লোকগুলোর পরনের ঝালর বসানো রংচঙে দশ ফুটিয়া পোশাক। যার ওপর আবার উপরি হিসেবে চাপানো রয়েছে ঢাউস আকারের একখানা করে ছাপানো ফ্লেক্স। বস্তুতঃ বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ ওই ফ্লেক্স প্রদর্শনের জন্যই এত ঘটা করে এই রণ পা মিছিল। বিজ্ঞাপণের ব্যাকরণে যে ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় বি-টি-এল। অর্থাৎ বিলো দ্য লাইন অ্যাক্টিভিটি। এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির মূল নির্যাস হল, খবরের কাগজ, টেলিভিশন বা হোর্ডিংয়ের মতো খরচ সাপেক্ষ মাধ্যমে প্রথাগত বিজ্ঞাপন না করে, একদম জনতার মুখোমুখি পৌঁছে যাও। কিন্তু তাই বলে আবার পাতি ভ্যান রিক্সায় ঘুরে মাইক ফুঁকে ফুঁকে প্রচার চলবে না। এমন কিছু একটা করতে হবে, যা দেখে লোকে চমকে উঠবে।

যেমন এই রণপা। ছোটবেলায় কিশোর উপন্যাসের পাতায় রণপা চেপে ডাকাত দলের বন পার হওয়ার বিবরণ পড়ে যথেষ্ট রোমাঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু আজকে প্রথমবার ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখে মনে হল, ভারী জটিল

এর কলা কৌশল। কোনও প্রমাণ তালগাছ সম উচ্চতায় একটা মানুষের পক্ষে ব্যালেন্স করে দাঁড়ান কি চাট্টিখানি কথা? আর তাছাড়া ওই উচ্চতায় চড়তে গেলেও রীতিমত উচ্চমানের দক্ষতা থাকা দরকার। এই লোকগুলো নিশ্চয় মই বেয়ে বেয়ে ওই বাঁশের ডগায় চড়ে বসেনি!

মিছিল দেখছিলাম আর এইসব ভাবছিলাম। হঠাৎ পিঠে এক সজোর থাবড়া। কলিজাখানা একদম পাঁজরের হাড়ে বাউন্স করিয়ে দিল। চমকে পেছন ফিরে দেখি, মানিক মন্ডল। চোখাচোখি হতে, সে এক গাল হেসে বলল, কী? কেমন দেখছো? দিব্যি জমে গেছে না ব্যাপারটা?

জবাবে আমি গম্ভীরভাবে বুক মালিশ করতে করতে বললাম, হুঁম।

গম্ভীরভাবে, কারণ আমি এসেছি পরিদর্শনে। আর পরিদর্শকের ভাব ভঙ্গীতে যদি সমালোচনার গন্ধ না থাকে, তবে তার ভূমিকা লঘু হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কর্তব্য ভার, আমাকে মুখ ভার রাখারই পরামর্শ দিল। সে যতোই মানিক আমার পরিচিত বন্ধু হোক না কেন। আপাততঃ সমালোচনার একমাত্র যে অ্যাঙ্গলটি খুঁজে পেয়েছি, সেটাকেই অস্ত্র করে নিয়ে, আমি আরও গম্ভীর স্বরে তাকে বললাম, ব্যাপারটা যে এতটা গগনচুম্বী, আমার মোটেই আন্দাজ ছিল না। এটাই আবার আমাদের ক্যাম্পেনের জন্য ড্র ব্যাক হয়ে দাঁড়াবে না তো?

—কেন? ড্র ব্যাক হবে কেন?

মানিক বেশ অবাক হয়ে গেল। তারপর নিকটতম রণপা-র ডগার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, দেখো তো, কতো উঁচু জিনিষটা। অনেকদূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনে এটাই তো চাই!

—কিন্তু আকাশপানে চেয়ে হাঁটতে গেলে যে শহরের পথে হুমড়ি খেয়ে বিপদ ঘটার চান্সও আছে। কেউ মামলা ঠুকলে তখন ক্ষতিপূরণ কে দেবে মানিকবাবু?

আমার শেষ বাক্যে রসিকতার সুরটা ঠিক ধরে নিল মানিক। হো হো করে হেসে উঠে বলল, তিন বছর ধরে কলকাতায় রণপা ক্যাম্পেন চালাচ্ছি, বুঝলে! একদম নিশ্চিন্ত থাকো। আজ অবধি কোথাও ঝামেলায় পড়িনি। নাও, তোমার ছবিটবি তোলার তুলে নিয়ে গিয়ে ক্লায়েন্টকে রাজি করানোর ব্যবস্থা করো গিয়ে। আমি কাল পরশুর মধ্যে ফোন করে তোমাদের অপিসে আসছি।

রণপা বাহিনী ততক্ষণে উল্টোডাঙা পেরিয়ে মানিকতলার দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়ে মানিকও লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত তাদের অনুসরণ করল।

মানিকের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া যাক এখানে। রোগা ও ঢ্যাঙা তার অবয়ব। এবং প্রধান বিশেষত্ব হল, কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ি ও সিংহ কেশরের মতো এলোমেলো চুল। চিরকাল দেখে এসেছি ওর গায়ে আধময়লা এক রঙা পাঞ্জাবি এবং কখনও কখনও কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলাও। আর ওর চোখের ভাষা, সব সময় ভাবালু হাসি মাখা। সব মিলিয়ে, ব্যক্তিত্বে বেশ একটা দার্শনিক পীরবাবা ধরনের ভাব আছে।

আর্ট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মানিক। অথচ ছবি আঁকে না। ওর একটি ব্যবসা সংস্থা আছে, যা বড় বড় বিজ্ঞাপন এজেন্সির হয়ে গ্রামে গঞ্জে বি-টি-এল প্রচারকার্য করে বেরায়। কখনও হতে পারে সেটা জেলায় জেলায় দেয়াল লিখনের কাজ। কখনও বা হাটে বাজারে ভিডিও ভ্যান কিংবা লোক শিল্পীদের নিয়ে অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনী প্রচার। মানিকের ভাষায়, পুরোটাই 'চর্কিপাক ও তুর্কিনাচন'। তবে, সে সব

> মানিকের পোশাক পরিচ্ছদে আমি মাঝে মাঝেই খুঁজে পাই আমার এক অতি পরিচিত প্রিয়জনের ঝলক। কিন্তু তার সঙ্গে মানিকের যে দ্বিতীয় মিল, সেটা আরও অব্যর্থ। কারণ ও যখনই কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, আমার নাকে ভেসে আসে ছাপাখানার কালির এক অদ্ভুত মাদকতাময় গন্ধ। ঠিক যে গন্ধ আমি পেতাম আমার সেজো জেঠুর কাছে গিয়ে বসলে।

কাজের শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতি বছর কিন্তু খেটেখুটে একটি করে উপন্যাস লিখে ফেলে সে। এবং বইমেলায় তার বইয়ের এতই ভাল কাটতি যে ইদানীং নিজের প্রকাশনা থেকেই সেই বই ছাপছে। সমাজের এমন এমন সব চরিত্র ওর লেখায় উঠে আসে, যাদের কথা বলার মতো অভিজ্ঞতা এবং অনুভব একান্তই মানিকের নিজস্ব। বলকে গেলে, পাঠক হিসেবেই ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্রপাত। যাই হোক মানিক নিয়ে মহাভারত আর এখানে নয়। মানিকের প্রসঙ্গ উঠল এবং এতদূর বর্ণিত হল, সম্পূর্ণ অন্য কারণে। প্রথমত, ওর হাবে ভাবে এবং পোশাক পরিচ্ছদে আমি মাঝে মাঝেই খুঁজে পাই আমার এক অতি পরিচিত প্রিয়জনের ঝলক। অবশ্য মানিক এখন যে বয়সের, তার চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক চেহারায় সে মানুষটিকে আমি বারবার দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে মানিকের যে দ্বিতীয় মিল, সেটা আরও অব্যর্থ। কারণ ও যখনই কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, আমার নাকে ভেসে আসে ছাপাখানার কালির এক অদ্ভুত মাদকতাময় গন্ধ। ঠিক যে গন্ধ আমি পেতাম আমার সেজো জেঠুর কাছে গিয়ে বসলে। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের কাছে ছিল জেঠুর প্রেস। সেই দোকান ভাঙা পড়লে কিছুদিনের জন্য প্রেস সরে এল পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে এক গ্যারেজ পাড়ায়। আর সব শেষে, টাউন স্টেশনের পাশে হকার মার্কেটে তার অন্তিম ঠিকানা। প্রেসের এই গোটা মাইগ্রেশন পর্ব প্রায় দশ বছরের। অর্থাৎ তারই মধ্যে ক্লাস থ্রি থেকে আমি হায়ার সেকেন্ডারি অবধি আমার শিক্ষার্থী সফর সেরে ফেলেছি। পড়াশোনার একঘেয়ে চর্বিত চর্বণ আমার জন্য কখনওই তেমন সুখকর ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই হাঁপিয়ে পড়ে আমি জলপাইগুড়ি থেকে একবেলার

জন্য পালিয়ে চলে আসতাম শিলিগুড়িতে, জেঠুর প্রেসে। ট্রেডল মেশিনের একটানা ঘটাঘট, কালি আর কাগজের গন্ধ এবং কাঠ কিংবা লিনোলিয়াম শিটে সার্জিক্যাল নাইফ দিয়ে ব্লক খোদাই... এই সব কর্মকান্ডের মধ্যেই কী যে এক অমোঘ আকর্ষণ। বলা যেতে পারে, ওই জগতটাই ছিল আমার তখনকার এইম ইন লাইফ। গল্প শুনতাম যে প্রথম যৌবনে, ডুয়ার্সের যেখানে যেখানে নতুন রাস্তা তৈরি হত, জেঠু সেখানে মাইলস্টোন লেখার কাজ নিয়ে মাসের পর মাস ঘুরে বেড়াত মজুরদের দলে ভিড়ে গিয়ে। আর নিজের চোখে তো দেখেইছি, তুলির টানে বা স্ক্যাপেলের আঁচড়ে কী অসাধারণ বাংলা ক্যালিগ্রাফি তৈরি করে ফেলতো জেঠু, এক লহমায়। এই জেঠুর কাছেই একনিষ্ঠভাবে নাড়া বেঁধে পড়ে থাকতে পারলে বোধহয় সে বয়সে আমি সব চেয়ে খুশি হতাম। কিন্তু যাই হোক, নানা পরিস্থিতির কারণে সে আর সম্ভব হয়নি।

কিন্তু অল্প সময়ের যেটুকু সান্নিধ্য, তাতেই অনেক রকমের মজার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল জেঠু। যতদূর মনে পড়ে, তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছে। জেঠু একদিন সন্ধেবেলায় সুন্দর একটা ফুলস্কেপ খাতা হাতে ধরিয়ে দিল। বলল, রোজ দুপুরে একপাতা করে ইংরেজি আর এক পাতা করে বাংলা লিখে খাতা ভরাতে হবে। উদ্দেশ্য ছিল, মূলত হাতের লেখা সুন্দর করার চর্চা। কিন্তু একটাই লাইন বার বার করে লেখার একঘেয়েমি সাংঘাতিক। তা থেকে মুক্তি পেতে জেঠু পরামর্শ দিল, যা মনে আসে রোজ একটু একটু করে গল্পের মতো করে লিখে ফ্যাল না!

কিন্তু আমিও কম চালাক নই। বললাম, যে গল্প কেউ পড়বে না, খামোখা খাটুনি করে লিখব কেন? জেঠু তখন মানিক মন্ডলের মতোই এক চোখ ছোট করে পীরবাবা ধরনের হাসি হেসে বলেছিল, কেন রে? আমি তো আছি। একজন পাঠকও তো পাঠক!

ব্যাস! আমিও পাঠ্য ইতিহাসের অনুপ্রেরণায় একেবারে রাজপুতানার পটভূমিকায় চলে গিয়ে শুরু করে দিলাম জীবনের প্রথম কাহিনি রচনা। ঘটনাচক্রে, সে গল্প অনেকটাই আলাউদ্দিন খিলজি আর পদ্মাবতীর কাহিনির ছায়া অবলম্বনে। আগে বাংলায় লিখি এক দু' লাইন করে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের পাতায় করে ফেলি তার ইংরেজি তর্জমা!

> সুস্থ ও কর্মরত অবস্থায় জেঠুর সঙ্গে শেষবার দেখা হয় শিলিগুড়িতে এক দুপুরে। আমি তখন চেন্নাইয়ের একটি করেসপন্ডেস কলেজে সস্তায় সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং ফটো ফিল্ম ডেভেলপ করার দুটি কোর্সের খবর পেয়েছি। কোর্সটা করতে চাই শুনে যথারীতি খুব উৎসাহ দিল জেঠু। বলল, যা টাকা লাগবে আমি দেব।

তখন জেঠু জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে প্রেস সামলায়। সকাল আটটা ন'টায় তার বেরিয়ে পড়া, আর ফিরতে ফিরতে আবার সেই রাত আটটা ন'টা। এখন বুঝি, সেই জার্নির ধকলটা কীরকম আর দিনের শেষে শরীর তখন কতটা ক্লান্ত থাকে। কিন্তু তারপরেও, রোজ আমার আবোল তাবোল লেখায় ভরা দুটো করে পাতা একদিনের জন্যেও পড়া বাদ দেয়নি জেঠু। এবং শুধু পড়া তো নয়... মিটি মিটি হাসতে হাসতে রীতিমত তারিয়ে তারিয়ে পড়া! তার মধ্যে, মাঝে মাঝে আবার একটা করে সরস মন্তব্য! যা শুনে আমার মধ্যে পরের দিন আরও জান লড়িয়ে জমিয়ে লেখার খিদেটা জেগে ওঠে! হাতে গরম তৈরি পাঠকের জন্য এভাবে লেখার মজাই যে আলাদা!

আর ওই যে এক লাইন করে বাংলা লিখেই চট করে ভেবে তার ইংরেজি করে ফেলা... প্রায় এক মাসের এই কসরত, পরবর্তী কালে কর্মজীবনে ভারী অদ্ভুতভাবে আমার কাজে লেগে গিয়েছিল।

সেই ঘটনা বলতে আবার বছর কুড়ি এগিয়ে আসতে হয়। জলপাইগুড়ি ছেড়ে কলকাতায়। আমার চাকুরিস্থল, এক ঘরোয়া বাঙালি বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে। মিডিয়া ডিপার্টমেন্টে তখন সদ্য সদ্য এক সাহেবি ঘরানার এজেন্সি থেকে রিটায়ার্ড হয়ে এসে জয়েন করেছেন চাকীদা। সেখানে এতকাল যে ঠাঁটবাট দেখে এসেছেন ভদ্রলোক, তার তিল মাত্রও আমাদের এখানে উপস্থিত নেই। যদিও দু' জায়গাতেই মূল কাজটা একই ধরনের।

সেদিন দুপুর বেলায় একটা আর্জেন্ট কাজ এসেছে। এক ক্লায়েন্টের হাফ পেজ বিজ্ঞাপন বের করতে হবে পরদিন ইংরেজি ও বাংলা কাগজে। দুপুর থেকেই স্টুডিওতে তাই নিয়ে সাজো সাজো রব। আর বাইরে রিসেপশনে ফোন ও ফ্যাক্স মেশিনের বোতাম টিপে টিপে চাকীদা পড়ি কি মড়ি করে সমস্ত পাবলিকেশনে স্পেস বুক করছেন ও অগ্রিম রিলিজ অর্ডার পাঠাচ্ছেন। এবং মাঝে মাঝেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে বলছেন, ইমপসিবল! এত শর্ট নোটিসে এভাবে কাজ হয়? আজকে কেলেঙ্কারি হবে!

ডিজাইনটা রেডি হতেই প্রায় সন্ধে ছ'টা বেজে গেল। মেটিরিয়াল কতক্ষণে পাওয়া যাবে জানতে চেয়ে ততক্ষণে সব কাগজ থেকে ঘন ঘন ফোন আসছে। যে ফোন সামলাতে সামলাতে চাকীদা, আকাশছোঁয়া টেনশনের শিকার। এবং ফোন ছেড়েই মন্ত্র জপের মতো প্রতিবার একই কথা বলছেন... উঃ! ইমপসিবল! কী করে যে কী হবে!

আমার সহকর্মী আর্টিস্ট গোপাল, মেজারমেন্ট মতো ডিজাইন শেষ করে সবে তখন কম্পিউটার ছেড়েছে আমাকে। এবার ফাঁকা জায়গা বুঝে আমি সেখানে হেডলাইন আর কপি ম্যাটার তৈরি করে বসাব। সেই মতো, বাংলা টাইপ করা শুরু করতেই চাকীদা হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তারপর চোখ গোলগোল করে বলল, কেলেঙ্কারি! সবে

বাংলা হচ্ছে? এরপর তো এটা ইংরেজির জন্য ট্রান্সলেশন করতে পাঠাতে হবে। ওরে বাপরে! সে হয়ে আসতে আসতে যে কাগজ ছাপা শুরু হয়ে যাবে ভাই!

আমি ততক্ষণে বাংলা হেডলাইনটা লিখে ফেলেছি। বিনা বাক্যব্যয়ে ইংরেজি ফন্ট সিলেক্ট করে ঝটাঝট এবার সেটার ইংরেজি করে দিলাম বাংলা লেখার পাশেই। চাকীদা একেবারে হাঁ! একইভাবে বাকি কপি ম্যাটারও এক লাইন এক লাইন করে বাংলা আর ইংরেজি পর পর হয়ে চলল। চাকীদার মুখে আর কথা সরে না।

আধ ঘণ্টা পরে, যখন ডিজাইন কমপ্লিট করে কাগজের অফিসে পাঠানো হয়ে গিয়েছে, কপালের ঘাম মুছে চাকীদা অবশেষে বলল, সত্যি ভাই, এত বছরে এরকম কোনওদিন দেখিনি। কপি রাইটাররা অন্তত দু' খানা সিগারেট টানবে কি চার কাপ চা খাবে। পনেরো মিনিট ধরে কলম চিবোবে। তারপর হয়ত এক লাইন ট্রানসলিটারেশন করবে। কিন্তু তোমাদের এখানে দেখছি ব্যাপারটা লাইটনিং ফাস্ট!

অত ফাস্ট হওয়ার আসল রহস্যটা অবশ্য সেদিন প্রকাশ করিনি। আসলে জেঠুর নির্ধারিত ওই অনুশীলন পদ্ধতিতে, এত সাধারণভাবে এই দক্ষতা আমার মধ্যে চলে এসেছিল যে ওটার কোনও বিশেষত্ব আছে বলেই কোনওদিন ভাবিনি!

যাই হোক। কথা হচ্ছিল গন্ধ নিয়ে। ছাপাখানার কালির গন্ধ। কথায় বলে কালি ছেটানো বা কালি মাখানো। কালি শব্দের প্রয়োগ সেখানে রীতিমত অপদস্থ করার অর্থে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত যেখানে ছাপাখানা, কালি তখন সৃষ্টির কারক। আর আমার ক্ষেত্রে তা আবার অপাপবিদ্ধ ও নিষ্কলুষ কল্পরাজ্যে প্রবেশের গেটপাস। ছাপাখানার কালির সেই চেনা ও প্রিয় গন্ধ আরেকজন মানুষের সান্নিধ্যেও পেয়েছি। রাজাবাজারের নূর আলি। চাকরিতে জয়েন করার পর প্রথমদিকে দেখতাম আমাদের এজেন্সি বহু ক্লায়েন্টের পোস্টার, প্যাকেজিং এবং শপ ডিসপ্লে ডিজাইন করত। আর নূর আলি ভাই হপ্তায় দু'-তিন বার করে আপিসে আসত সেগুলো ছাপিয়ে ডেলিভারি দিতে। এবং কী আশ্চর্য! জেঠুর মতো এরও পরনে সবসময় আধময়লা পাঞ্জাবি। আর পানের ছোপ মাখা দাঁতে যে হাসিটা সব সময় তার মুখে সেঁটে থাকত, সেটাও বস্তুত শিশুসুলভ সরল।

ডিটিপি এবং কম্পিউটার ডিজাইনের একেবারে প্রথম দিক সেটা। পেন্টিয়াম ওয়ান কম্পিউটারের মনিটর সব সাদা কালো। সে বছর পুজোর ছুটিতে জলপাইগুড়ি এসে শুনলাম পরিচিত এক বন্ধু শুভাশিস, ধুলাবাড়ি থেকে কম্পোনেন্ট নিয়ে এসে কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করার ব্যবসা করছে। নূর আলি সে কথা জানতে পেরে দু'খানা কম্পিউটারের অর্ডার করল তার কাছে। আর সেই সুবাদে আমার কপালে জুটে গেল কম্পিউটার শেখার সুযোগ।

নূর আলির ছাপাখানা রাজাবাজারের ভেতরে এক অন্ধকার গলির ভেতর তস্য অন্ধকার একটি বাড়ির দেড়তলায়। অবশ্য আমি আর গোপাল রোজ সেখানে রাতের বেলায় অফিস থেকে বেরনোর পরেই যেতাম। সুতরাং তখন অন্ধকার বিষয়ক কোনও আপত্তি ধোপে টেঁকে না!

রাত বারোটা একটা পর্যন্ত এক এক দিন সেখানে রয়ে যেতাম কম্পিউটার শেখার নেশায়। যে রাতে শিয়ালদহ স্টেশনের গেট বন্ধ হয়ে যেত, নূর আলি তার স্কুটারের পেছনে বসিয়ে আমায় যাদবপুর অবধি লিফট দিয়ে তারপর নিজের বাড়ি ফিরত, বেহালায়। পেছনের সিটে আমি বসলে, সে প্রথমে শক্ত করে ধরে বসার অনুরোধ জানাত। এবং অ্যাক্সিলেটার দাবানোর আগে প্রতিবারই এক কথা...'ভোয় পাবেন না কিন্তু...'

উল্কার গতিতে রাত চিরে এগিয়ে চলতে চলতে টের পেতাম ওই চেনা কালির গন্ধটা একটু একটু করে সত্যি হয়ে ওঠা একটা স্বপ্নের জোরাল রং ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ভিতর ও বাহির জুড়ে।

সুস্থ ও কর্মরত অবস্থায় জেঠুর সঙ্গে শেষবার দেখা হয় শিলিগুড়িতে এক দুপুরে। আমি তখন চেন্নাইয়ের একটি করেসপন্ডেন্স কলেজে সস্তায় সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং ফটো ফিল্ম ডেভেলপ করার দুটি কোর্সের খবর পেয়েছি। কোর্সটা করতে চাই শুনে যথারীতি খুব উৎসাহ দিল জেঠু। বলল, যা টাকা লাগবে আমি দেব। সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং বিষয়টা আমারও খুব জানার ইচ্ছে।

তখন ছিল ভি-পি-পি বা ভ্যালু পেয়েবল পার্সেল সিস্টেম। আমি কোর্সটা অর্ডার করলে, ওরা ডাকের মাধ্যমে স্টাডি মেটিরিয়াল এবং উপকরণ পাঠাবে। পোস্টম্যান ডেলিভারি দিতে এসে আমাকে টাকা দিয়ে সেই পার্সেল ছাড়িয়ে নিতে হবে। জেঠুর গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যেদিন আমি অর্ডার পাঠালাম, তার পরদিন শিলিগুড়ি গিয়ে দেখি প্রেসের দরজায় তালা। লোকজন কেউ নেই। পাশের দোকান থেকে জানতে পারলাম, আগের রাতে জেঠুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি।

বরাবরই একাকী জীবন পছন্দ ছিল জেঠুর। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য জলপাইগুড়ির বাড়িতে আসত ঠিকই। কিন্তু মনটা পড়ে থাকত ওই প্রেসেই। শিলিগুড়িতে একটি অনাথ ছেলেকে নিজের কাছে রেখে প্রেসের দেখাশোনার প্রায় সব কাজই শিখিয়েছিল। সেই স্বপনদাই তার দিবারাত্রির অনুচর। হাসপাতালে গিয়ে দেখা হল শয্যাশায়ী জেঠুর সঙ্গে। আমার চোখে জেঠুকে তখন মোটেই অসুস্থ লাগেনি। কিংবা হতে পারে, আমার কিশোর মনকে আরও ভারাক্রান্ত করতে না চেয়েই হয়ত জেঠু হাসি মুখে সুস্থতার ভান করেছিল। মোট কথা, ওটাই হল শেষ দেখা। জলপাইগুড়ি ফিরে এসে বাড়ির বড়দের সব জানালাম সেদিন রাতে। পরদিন তারা সব যাবে বলে ঠিক হল। কিন্তু জেঠু মারা গিয়েছিল রাত পোয়ানোর আগেই।

একটা মৃত্যুর সাথে অনেক শোক, দুঃখ, আচার ইত্যাদি জড়িয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের মধ্যেও আমার মাথায় সারাক্ষণ খালি ঘুরছে একটাই কথা। চেন্নাই থেকে পার্সেল এলে, সেটা ছাড়ানোর টাকা কোথায় পাই? একটাকা দু'টাকা নয়। পুরো আটশো টাকা চাই!

শিলিগুড়ি থেকে ডেডবডি যখন আনা হয়, স্বপনদাও সেই সঙ্গে এসেছিল। মুখাগ্নির সময় আমাদের সঙ্গে সে-ও সামিল হল সেই আচারে। বাবা এবং মায়ের পর জেঠু। আমার ক্ষেত্রে ওটাই শেষ সামাজিক শ্মশান আচার পালন। সত্যি বলতে কী, সে বয়সে আমার নিজস্ব ইচ্ছে প্রকাশ ও পালনের সর্বশেষ অবলম্বনটি সেদিন বিলীন হয়ে গেল মাসকলাইয়ের শ্মশানে। শীতের রাতে শ্মশান থেকে ফিরে স্নানের সময়, কাঁপতে কাঁপতে আসল কষ্টটা হচ্ছিল এই ভেবে, যে খুব একা লাগবে এবার থেকে। সব সমাধান নিজেকেই খুঁজতে হবে একা।

সরল সাদাসিধে স্বপনদা এমনিতেই খুব লাজুক এবং স্বল্পবাক। বাড়ির অন্যান্য জেষ্ঠ্য ব্যক্তিদের সামনে সেদিন সে আরও সংকুচিত। কারণ জেঠুর প্রেস এবং শিলিগুড়ির বাড়িটির কী বিলি বন্দোবস্ত হবে, অচিরেই তা নিয়ে আলোচনা আসন্ন। বছর দুই আগে স্বপনদাকে জেঠু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছিল। আর ততদিনে ওর এক সন্তানও জন্ম নিয়েছে।

আমার সঙ্গেই সেদিন রাতে তার শোয়ার বন্দোবস্ত। ঘরে এসে স্বপনদা বলল, একটা কথা আছে... আমি বললাম, আজ থাক না। সারাদিন এত ধকল গেছে। এখন শুয়ে পড়ো।

স্বপনদা ঠোঁট কামড়ে বলল, না, এখনই... না হলে শান্তি পাচ্ছি না...

এই বলে ফতুয়ার পকেট থেকে অনেকগুলো দলামোচড়া করা নোট বের করে আমার হাতে দিল। তারপর বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে বলল, জেঠু এটা দিয়েছিল আমায়, হাসপাতালে যাওয়ার আগে...। বলল, যদি কিছু হয়ে যায়... শ্মশানের জন্য...

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

ডুয়ার্সের গল্প গল্পকার ও গল্প নিয়ে আড্ডা

'রণক্ষেত্রের দামামা বেজে উঠল। লক্ষ লক্ষ সিপাহী, অশ্বারোহী সৈনিক ছুটে এল উন্মত্ত আক্রোশে। বিপরীত দিক থেকেও ঝাঁপিয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ, এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির। ঔপন্যাসিক তখন কোনও মিনারের চূড়ায় উঠে নোটবুকে টুকে নেবেন সমস্ত দৃশ্যটা। রাজার অঙ্গে লাল মখমলের পরিচ্ছদ, মাথার মুকুটে মণিমুক্তাহীরের জ্যোতি, সেনাপতির দুঃসাহসিক অভিযান, সৈন্যদের চিৎকার, এসবের একটি কথাও বাদ দেবেন না উপন্যাসিক। লিখে নেবেন কতগুলো হাতি, কত ঘোড়া এ যুদ্ধে যোগ দিল। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বর্ণনা ইনিয়েবিনিয়ে লিখে নেবেন তিনি। যুদ্ধ জয়ের পর সৈন্যদল দেশে ফিরবে যখন, তখনও পিছনে পিছনে ফিরবেন ঔপন্যাসিক। শঙ্খধ্বনি আর সমারোহের আনন্দ ছিটিয়ে আহ্বান জানাবে প্রবীণা আর নগরকন্যার দল। তাও লিখবেন ঔপন্যাসিক, বর্ণনা দেবেন তাদের, যারা উলুধ্বনির আড়ালে কলরব করে উঠল। তারপর? তারপর হঠাৎ তিনি ছোটগল্প-লেখককে দেখতে পাবেন পথের ধারে, একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন উদাস দৃষ্টি মেলে। এ কোন উন্নাসিক লেখক? —মনে মনে ভাববেন ঔপন্যাসিক। কোনও মিনারের চূড়ায় উঠল না, দেখল না যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শোভাযাত্রার সঙ্গ নিল না, এ কেমনধারা সাহিত্যিক! হয়ত এমন কথা বলবেনও তিনি ছোটগল্প-লেখককে। আর তখন, অত্যন্ত দীর্ঘ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ চেয়ে তাকাবেন ছোটগল্পের লেখক, বলবেন হয়ত, না বন্ধু, এসব কিছুই আমি দেখিনি। কিছুই আমার দেখার নেই। শুধু একটি দৃশ্যই আমি দেখেছি। পথের ওপারের কোনও গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করবেন তিনি, সেখানে একটি নারীর শঙ্কাকাতর চোখ সমগ্র শোভাযাত্রা তন্নতন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, চোখের কোণে যার হতাশার অশ্রুবিন্দু ফুটে উঠেছে— কে যেন ফেরেনি, কে একজন ফেরেনি। ছোটগল্পের লেখক সেই ব্যথা-বিন্দুর, চোখের টলোমলো অশ্রুর ভেতর সমগ্র যুদ্ধের ছবি দেখতে পাবেন, বলবেন হয়ত, বন্ধু হে, ওই অশ্রুবিন্দুর মধ্যেই আমার অনন্ত সিন্ধু।' —রমাপদ চৌধুরী।

ডুয়ার্স থেকে প্রকাশিত হয় অসংখ্য লিটিল ম্যাগ। সেখানে প্রকাশিত গল্পের প্রত্যেকটি লেখাই যে সার্থক কিংবা উঁচু দরের সাহিত্য তা নয়। কিন্তু যাঁরা তন্নিষ্ঠ পাঠক, যাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডুয়ার্সের পত্রিকাগুলোর পাতায় সন্ধানী চোখ রাখেন, তাঁরা তার মধ্যেই খুঁজে পান হিরের টুকরোর মতো ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল কিছু গল্প। গল্পগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সচকিতভাবে আবিষ্কার করেন, কতক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিকের কোনও কোনও লেখক লিখছেন, কত বিভিন্ন আঙ্গিকে, ভাষার মাধুর্যে কিংবা ঐশ্বর্যে কত না রকমফের। কখনও বৃত্তমুখী গল্পকে পরিত্যাগ করে কেউ কেউ ছোটগল্পের সংজ্ঞাকেই বদলে দিতে চেয়েছেন। কেউ কেউ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লিখেও শুধুমাত্র স্নিগ্ধ সারল্যেই রস সৃষ্টি করেছেন সার্থকভাবে। পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনও কোনও লেখক অক্লান্ত, ভাষার পরিচর্যা থেকে ও বুনোনের পারিপাট্যে তাঁরা কম সযত্ন নন। বিভিন্ন দশক জুড়ে বাংলা কথাসাহিত্যে ছোটগল্পের পটপরিবর্তন ঘটেছে, বদলেছে আঙ্গিকের রীতি-প্রকৃতি, বিষয় বৈচিত্র্যে এসেছে বিস্তৃতি। ডুয়ার্সের গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই এই চলমানতাকে বরণ করে নিয়েছেন।

ডুয়ার্সে নবীন প্রজন্মের মধ্যে যাঁরা ছোটগল্প নিয় চর্চা করছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুটো নাম হল শাঁওলি দে আর হিমি মিত্র রায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন নামী ও অনামী পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে এঁদের লেখা ছোটগল্প। এই কলমচির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের আগ্রহ ছিল ছোটগল্পের প্রসার নিয়ে কিছু একটা করার। তাঁদের কথায় রাজি না হবার কারণ ছিল না। বাংলা ছোটগল্পের সাহিত্যমূল্য ও শিল্পরূপকে আমরা সম্মান জানাই। ডুয়ার্সে বাস করে যাঁরা লিখেছেন এবং যাঁরা এই সময়কালে ছোটগল্প লিখছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ। ছিল দু'জন, হলাম ত্রয়ী। ডেকে নেওয়া হল আরও দুই গল্পকার শ্বেতা সরখেল ও তনুশ্রী পালকে।

আমাদের মনে হয়েছিল একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার যেখানে ডুয়ার্সের লেখকেরা এক সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াবেন। একের সঙ্গে অপরের মত ও ভাবের আদানপ্রদান করা যেমন জরুরি, তেমনই দরকার নিজের নিজের লেখার ডালি নিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছান। স্থির হল ডুয়ার্সের সেই সব গল্পকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে যাঁদের গল্প নাড়া দিচ্ছে আমাদের। তাঁদের মুখোমুখি বসতে হবে। সেই আলাপন থেকে ঋদ্ধ হবে নিজেদের সাহিত্যচিন্তা। ভাবনার বিনিময় হবে নিজেদের মধ্যে।

গল্প নিয়ে কিছু একটা করার ভাবনা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল আমাদের। হাতের কাছে বেশ কিছু উদাহরণ ছিল। চন্দননগরে গল্পকার গৌর বৈরাগী আয়োজিত 'গল্পমেলা' বেশ কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়ে চলেছে। সেখানে প্রত্যেক মাসে সাধারণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে ডিসেম্বর মাসে যাপন করা হয় বার্ষিক গল্পমেলা। নামী গল্পকারদের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়িয়ে গল্প পাঠ করেন নবীন গল্পকার। সম্প্রতি কলকাতায় শুরু হয়েছে আরও একটি উদ্যোগ। যশোধরা রায়চৌধুরি, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, জয়া চৌধুরী, তৃষ্ণা বসাকদের 'গল্পবৈঠক'। এছাড়াও গল্পকার গৌর কারক নিয়মিত আয়োজন করে থাকেন

গল্পের আসর। সাহিত্যিক সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতেও নিয়মিত বসে গল্পপাঠের আড্ডা।

দু'হাজার ষোলো সালের জুলাই মাসে এক ছুটির দিনের বিকেলবেলা জলপাইগুড়ির আড্ডাঘর-এ ডাকা হয়েছিল কয়েকজন নামী-অনামী গল্পকার ও অল্প কিছু পাঠককে। আহ্বান জানানো হয়েছিল সেই সব মানুষকে যাঁরা অন্তর থেকে সাহিত্য ভালবাসেন। গল্প নিয়ে আড্ডা দেওয়া হল একদিন। প্রথম আড্ডার দিনই মনে হয়েছিল এই উদ্যোগের সুফল একদিন নিশ্চয়ই ফলবে। কেন না আজ যা অঙ্কুরিত বীজ আগামিকাল তা মহীরুহ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। সময়ের গর্ভে নিহিত ছিল সেই প্রশ্নের উত্তর।

সেবারের পর প্রত্যেক মাসেই নিয়ম করে গল্প নিয়ে আড্ডা দিয়েছি আমরা। আমাদের আড্ডায় এসেছেন সমীর রক্ষিত, অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ কর্মকার, বিপুল দাস, সেবন্তী ঘোষ, সৌম্যশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, শাশ্বতী চন্দ, রম্যাণী গোস্বামী, তপতী বাগচী, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, শুভময় সরকারের মতো বেশ কিছু গল্পকার, যাঁদের নাম পাঠকের কাছে পরিচিত। এঁদের রচনার স্বাদ পাঠকের অজানা নয়। পাশাপাশি এই আড্ডাতেই শোনার সুযোগ হয়েছে অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, শ্যামল সরকার, দেবযানী সেনগুপ্ত, সৌমেন্দ্র তালুকদার, গীর্বাণী চক্রবর্তী, রুমি নাহা, শ্রুতি দত্ত রায়, রাখী পুরকায়স্থ, দেবপ্রিয়া সরকারের মতো লেখকের নতুন স্বাদের গল্প। তাঁদের রচনাগুলি কোথায় অনন্য, কোথায় অনবদ্য, কোথায় ঋদ্ধ তা জানার সুযোগ হয়েছে সকলের। রণজিৎ মিত্র ও কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিটি আসরে উপস্থিত থেকেছেন, আড্ডায় পাঠ করা গল্প নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করে ভাবনার খোরাক জুগিয়েছেন।

এই নভেম্বরে গল্প নিয়ে আড্ডা টিমের ছিল ষোলোতম গল্পবৈঠক। এর আগে জলপাইগুড়ি শহরেই ফি মাসে নিয়ম করে আয়োজিত হয়েছে গল্পের আসর। এই প্রথম শহরের বাইরে কোথাও যাওয়া। আমাদের গন্তব্যের কাছেই বাংলাদেশ সীমান্তের তিনবিঘা। বড় রাস্তার ধারেই চোখে পড়ে কাঁটা তারের বেড়া। তার ওপারে বাংলাদেশ। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ। আমরা, যাদের বাপ-ঠাকুরদা কয়েক যুগ আগে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এই বঙ্গে এসেছিলেন তাদের বুক ফেলে আসা ভিটের টানে একটু হু হু করবেই।

এই নভেম্বরে গল্প নিয়ে আড্ডা টিমের ছিল ষোলোতম গল্পবৈঠক। এর আগে জলপাইগুড়ি শহরেই ফি মাসে নিয়ম করে আয়োজিত হয়েছে গল্পের আসর। এই প্রথম শহরের বাইরে কোথাও যাওয়া। আমাদের গন্তব্যের কাছেই বাংলাদেশ সীমান্তের তিনবিঘা।

গন্তব্যে পৌঁছাতেই ফিনফিনে কাচের শৌখিন পেয়ালায় সূর্যাস্তের রং ধার করা দার্জিলিং চা এল প্রথমে। সঙ্গে সুবাসিত টা। কাজু বরফি, পেস্তার গুঁড়ো দেওয়া সন্দেশ, রাক্ষুসে সাইজের মালাই চপ, হলদিরামের চানাচুর, পনির পকোড়া আর ডিমের চপ। গল্প নিয়ে আড্ডা বসাতে জলপাইগুড়ি থেকে আটত্রিশ কিমি পাড়ি দিয়ে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায় পৌঁছে এমন বরযাত্রীর মতো রাজকীয় ঢঙে আপ্যায়িত হয়ে আমরা তখন রীতিমত আপ্লুত।

চ্যাংরাবান্ধা বিডিও অফিসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মানের। ইন্দো বাংলাদেশ মিটিং সাধারণত এই কক্ষেই হয়ে থাকে। এই ঘরেই শুরু হল আমাদের গল্প নিয়ে আড্ডা। এই সময়ের প্রথম সারির সমস্ত পত্রপত্রিকায় যাঁর গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয় সেই সৌম্যশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক এসেছিলেন দুর্গাপুর থেকে। বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সৌম্যশংকরের পিতামহ।

হেমন্তসন্ধ্যায় শুরু হল গল্পপাঠ। তপতী বাগচী, তনুশ্রী পাল, শাঁওলি দে, হিমি মিত্র রায়, লক্ষ্মী নন্দী গল্প পড়লেন। মাথাভাঙা থেকে এসেছিলেন অকাদেমি পুরস্কার পাওয়া 'তিতির' পত্রিকার সম্পাদক সঞ্জয় সাহা। প্রত্যেকটি গল্পের তীক্ষ্ণ ও তীব্র সমালোচনা করে আসর জমিয়ে দিলেন সঞ্জয়। পঠিত মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে আলোচনা করলেন প্রসন্নদেব মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা কোয়েলা গঙ্গোপাধ্যায়। মেধাবী রসবোধ দিয়ে আড্ডা সঞ্চালনা করলেন রণজিৎ মিত্র। আড্ডায় শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লব সরকারের মতো বেশ কয়েকজন স্থানীয় কবি ও গল্পকার। হাজির ছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সাংবাদিক সুশান্ত গুহ।

ব্লক অফিসে গল্প নিয়ে আড্ডা বসেছে জানতে পেয়ে মহকুমা শাসক রঞ্জন চক্রবর্তী ছুটে এসেছিলেন এক ঘণ্টা দূরের মাথাভাঙা মহকুমা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল তিনি আদ্যন্ত পড়ুয়া মানুষ। ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসিক সাহিত্য থেকে কোট করছিলেন অনায়াসে। পঠিত গল্প নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। সেই গল্পের বক্তব্যবিষয়, বিন্যাসকৌশল ও অভিমুখ নিয়ে আগ্রহী প্রশ্ন করছিলেন গল্পকারকে। খুলে যাচ্ছিল গল্পগুলোর নতুন নতুন দিগন্ত। তিনি নিজেও লেখার চর্চা করেন। যাঁর অনুরোধে আমাদের চ্যাংরাবান্ধা যাওয়া সেই সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিরূপাক্ষ মিত্র পাঠ করলেন রঞ্জনবাবুর লেখা একটি চমৎকার গল্প। কথায় বলে ঘোড়া দেখে মানুষ খোঁড়া হয়। এই কলমচির অনুরোধ ফেলতে না পেরে তাঁর লেখা একটি গল্প ব্যারিটোন গলায় পড়লেন সঞ্জয় সাহা। গল্প পাঠ করার পর যেটুকু হাততালি পড়ল, স্বীকার করে নেওয়া ভাল, তার জন্য গল্পকার এক শতাংশও দায়ী নন। গল্পটি শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল সম্পূর্ণ সঞ্জয়ের সুললিত বাচিকের গুণে।

সকলে যখন নিবিষ্ট হয়ে গল্প শুনছিল, মগ্ন ছিলেন গল্প নিয়ে আলাপনে, যাপন করছিলেন একটি মগ্ন সন্ধ্যা এই কলমচির তখন বছর দেড়েক আগের কথা বারবার মনে পড়ছিল। রমাপদ চৌধুরীর কোটেশন দিয়ে এই ডায়েরি শুরু হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে বলি, সার্থক ছোটগল্পে আমরা খুঁজি আমাদের জীবনের জলছবি। সন্ধান করি মধ্যবিত্ত জীবনের অচরিতার্থ আকাঙ্খা, সম্পর্কের ভাঙন, সমস্ত নঞর্থক অভিরুচি ও আশ্চর্য উত্তরণের ব্যতিক্রমী উদ্ভাস। দেশকালের সীমা এক পাঠ-অভিজ্ঞতায়, অভিনব কোনও জীবনবোধ।

গল্প নিয়ে আড্ডার এক অনন্য অভিযাত্রা শুরু হয়েছে ডুয়ার্স থেকে। যত পথ হাঁটছি আমরা, সমমনস্ক মানুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে হাত মেলাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। সমকালের প্রথম সারির চিত্রশিল্পী ও ইলাসট্রেটর দেবাশিস সাহা ভালবেসে ডিজাইন করে দিয়েছেন 'গল্প নিয়ে আড্ডা'-র ভারী সুন্দর একটি লোগো। সেটাই ব্যবহার করছি আমরা। আমরা জানি, ডুয়ার্সের গল্পকারদের হয়ে ওঠা অথবা না-হয়ে ওঠা ছোটগল্পগুলোর মধ্যে যৎসামান্য কিছু লেখাই হয়ত কালের পরিধি অতিক্রম করতে পারবে। বেশিরভাগ লেখাই পারবে না। যে গল্পগুলো অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, তারা তাঁদের নিজস্ব সংরাগে হয়ত সফর করবে মনখারাপের কোনও এক ভিজে স্টেশনের দিকে। কিন্তু প্রত্যয়ের মশাল হাতে ডুয়ার্সের গল্পকারদের এই পথ চলা জারি থাকবে, যতদিন এই জীবন। গন্তব্যে পৌঁছানটা বড় কথা নয়, একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পথ হাঁটার আনন্দটাই আসলে স্বর্গীয়।

বাহান্ন বছর পরে আবার সেই চা বাংলোয় সৌমিত্র

বাহান্ন বছর পর আবার একই চা বাগানে ফিরলেন তিনি। ১৯৬৫-র ডুয়ার্স আর এই ২০১৭-র ডুয়ার্সের মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাত হবেই তা আন্দাজ করাটা তার মতো বিচক্ষণ মহীরুহের খুব একটা অসুবিধে হয়নি। তাই অবাক হননি ঠিকই কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে স্মৃতিকাতরতা কি গ্রাস করেছিল তাঁকে?

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ও ভারতীয় সিনেমার এই কিংবদন্তি গত ২৮ অক্টোবর ডুয়ার্সের মেটেলি লাগোয়া ইনডং চা বাগানে একটা রাত কাটিয়ে গেলেন। এই চা বাগানেই ১৯৬৫-তে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে প্রথম এসেছিলেন। আমাদের মত নিশ্চয়ই তাঁরও মনে পড়ে যায়সেই কাপুরুষ মহাপুরুষের কথা, পর্দায় সেই ঝড় জলের রাত, চা বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই আতিথ্য নেওয়া। বাংলোয় ঢুকেই সিনেমার মোড় ঘুরে যাবে। কলকাতার প্রেম যা পরিণতি পায়নি সেই প্রেমিকাই এখানে চা বাগানের ম্যানেজারের স্ত্রী। সৌমিত্র, হারাধন, মাধবী দে'র সেই অবিস্মরণীয় অভিনয় যে একবার দেখেছে সে কখনই ভুলবে না। সেই চা বাগানের সাহেবি বাংলোটাই ইনডং চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো। যেখানে আজ এতগুলো বসন্ত পর আবারও সৌমিত্র। হেমন্তের দিনের আলো ঝুপ করে নেমে পড়তেই গায়ে মৃদু শালের উষ্ণতা জড়িয়ে বাংলোর বৈঠকখানায় বসলেন সৌমিত্র। এক্ষন পত্রিকার এই অন্যতম সম্পাদক জলপাইগুড়ির এই চা-বাগানে বসে স্পষ্ট ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি শব্দটা উচ্চারণ হলেই প্রথমে মনে আসে দেবেশ রায়ের নাম, তারপর সমরেশ মজুমদার। দেবেশ সমরেশ-দের এই তিস্তা পাড়ের দেশ কতটা বদলে গেছে জানতে চাইলে সৌমিত্র মৃদু হাসেন। তাঁর কথায় বদল শুধু একটু আধটু নয়। পুরোটাই, আমি তো এখানে এসে কিছুই মেলাতে পারছি না!

উল্লেখ্য এবার সিনেমা বা নাটক নয়, সম্পূর্ণ অন্য কারণে ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এই ডুয়ার্স সফর। এক সময়ের ধুঁকতে থাকা ইনডং চা-বাগান এখন যোগ্য পরিচালকের হাতে পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। শুধু বাণিজ্য নয়, নতুন মালিকপক্ষ শ্রমিক স্বাচ্ছন্দ্যকেও গুরুত্ব দিতে চাইছেন, সেই কারণে চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য ঝাঁ চকচকে ক্লাব ঘর বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, সেই সঙ্গে হাতের কাজ শেখার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। এই বিনোদন কক্ষের উদ্বোধনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। সন্ধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে হাতের নাগালে পেয়ে চা-শ্রমিকদের সেই মাদলের তালে নাচ চলছে, আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম অরণ্যের দিনরাত্রির সময়ে। শাল, পিয়াল, মহুয়ার জঙ্গলেও তো এভাবেই কত নাচ কত গান।

কাপুরুষ মহাপুরুষ ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সৌমিত্র যখন মাইক ধরলেন তখন ওর একটাও সিনেমা না দেখা আদিবাসী তরুণটিরও অপলক ভঙ্গী। ওরা কি ওঁর মধ্যে চিরচেনা কাউকে খুঁজে পেল, সৌমিত্র বললেন, 'আপনাদের যদি কোনও সামান্য কাজেও আমি লাগতে পারি তাহলে একবার ডাকবেন আমি সব কাজ ফেলে ছুটে এখানে চলে আসব'। আশি বছরের যুবকের এরকম কথার পর আর বোধহয় কিছুই বলার থাকে না। অনুষ্ঠান শেষে আমরা তাই ঘোর লাগা হৃদয়ে বাইরে আসি, সামনের উপত্যকা জুড়ে তখন রাতের আলো জ্বলে উঠেছে।

সব্যসাচী ঘোষ

সাহিত্য ক্লাবের তৃতীয় আড্ডা

২৫ নভেম্বর ২০১৭ সন্ধ্যায় 'এখন ডুয়ার্স সাহিত্য ক্লাব'-এর তৃতীয় মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল আড্ডাঘর ক্লাবে। হালকা শীতের পরশ, সঙ্গে চা-কফির উষ্ণতায় আড্ডা জমে উঠতে দেরি হয়নি। কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও হলদিবাড়ি থেকে কবিরা এসেছিলেন। কথা ছিল, শ্রীমতিরা কবিতা-অনুগল্প পাঠ করবেন; শ্রীমানরা শুধুই শ্রোতা, মাঝে মধ্যে অল্পস্বল্প ফোড়ন কাটা অবধি চলতে পারে। হলও তাই। তপতী, অনিন্দিতা ও জয়শীলা মালা গাঁথার কাজ সামলে নিজস্ব রচনা শোনালেন। বিজয় দে-র ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্ন বৈঠকের মেজাজটা উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল। উমেশ শর্মা উচ্ছ্বসিত ছিলেন তারিফের অকৃপণতায়। তনুশ্রী বলেছিলেন আসতে দেরি হবে, কথা রেখেছিলেন— কিন্তু কবিতার অনুসঙ্গে অদ্বিতীয়া। গৌতমের কথায় বাংলাদেশ সাহিত্য সম্মেলনের কোলাজ ভেসে এল। মহাকাণ্ডারী প্রদোষ ও দোসর শুভ্র অনেকটা দেরিতে এলেও আড়ালে, কারণ অনিবার্য।

অলীককে, আমি কিছু একটা পড়তে বলেছিলাম, ওর লেখা মানেই বাঁধভাঙা অনুভবের জলছবি। শিলিগুড়ির সহজিয়া কবি মহুয়া চশমা ছাড়াই উৎরে দিলেন সরল দক্ষতায়। পাশেই কবিতার আল্পনা কোচবিহারের কালো হরিণ চোখ— মাধবী।

প্রথম কবিতা পড়েছিল দেবপ্রিয়া যথেষ্ট উচ্চগ্রামে, তবুও কিছু অর্বাচীনের কোলাহলে, টেবিল টেনিসের শব্দে, কবিতা না শুনতে-শোনাতে পারা ব্যথা রয়ে গেল। যে দু-চার জন শুনেছেন তাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বিজয় দে, তপতী বাগচী, অনিন্দিতা, জয়শীলা ও অলীকের কবিতার গঠন ও ভাঙা গড়া নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনায় ঋদ্ধ হয়েছি। শেষ হয়েছিল তপতীর একটা ছোট গল্পে যার রেশে স্তব্ধ হয় আড্ডাঘব। আগামী ২৪ ডিসেম্বর তারিখ বিকেলে চতুর্থ অধিবেশন।

প্রশান্ত চৌধুরী,
সভাপতি, আড্ডাঘর ক্লাব,
জলপাইগুড়ি

BHALOBASHI BANGLA

WEST BENGAL TOURISM
www.wbtourism.gov.in
www.wbtdcl.com

পরিবর্তনের পথে...
নতুন চোখে বাংলা

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-15 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.